“মিলিন্দ প্রশ্ন’গ্রন্থেরআলোকে বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্ব: একটিপর্যালোচনা”

এম.ফিলডিগ্রিরজন্য উপস্থাপিতঅভিসন্দর্ভ

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজবিভাগ

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. সুকোমলবড়ুয়া

তত্ত্বাবধায়ক

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজবিভাগ

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়

মোছা: ইনসেরে জেমী

এম.ফিলগবেষক

রেজি নং-১৯৫

শিক্ষা বর্ষ: ২০১২-২০১৩

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজবিভাগ

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: ০৪ মে ২০১৭খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

Professor Dr. Sukomal Barua
Former Founder Chairman
Department of Pali and Buddhist Studies
Former Founder Director
Center for Buddhist Heritage & Culture
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
E-mail : skbaruadu@gmail.com
Cell No.: +880-01715-023848
PABX : +880-2-9661900/6170 (Office)
Fax No. +880-2-9667222

প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া
সাবেক প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
সাবেক প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ এন্ড কালচার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ই-মেইল : skbaruadu@gmail.com
মোবাইল : +৮৮০-০১৭১৫-০২৩৮৪৮
পিএবিএক্স : +৮৮০-২-৯৬৬১৯০০/৬১৭০ (অফিস)
ফ্যাক্স নং : +৮৮০-২-৯৬৬৭২২২

তারিখঃ ০৩-০৫-২০১৭খ্রিঃ

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের এম ফিল গবেষক মোছাঃ ইনসেরে জেমী রেজিঃ১৯৫/২০১২-২০১৩) আমার তত্ত্বাবধানে "মিলিন্দ প্রশ্ন" গ্রন্থের আলোকে বৌদ্ধ দর্শন তত্ত্বঃ একটি পর্যালোনা" শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিধিবদ্ধ নিয়মসমূহ এটিতে অনুদৃত হয়েছে। পালি সাহিত্যে "মিলিন্দ প্রশ্ন" গ্রন্থটি একদিকে যেমন সাহিত্যসমৃদ্ধ তেমনি যুক্তি, উপমা ও বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বে এটি বিশ্বের পণ্ডিত ও দার্শনিকদের নিকট অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। গ্রন্থটিতে ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব এবং জটিল বিষয় সমূহের বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান গ্রন্থটিকে আরো শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক এবং বৌদ্ধদর্শন ও তত্ত্বানুসন্ধানী পাঠকদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষন করা হয়েছে। গবেষক বেশ নিষ্ঠা, সততা ও গভীর অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে এ গবেষণা কর্মটি শেষ করেছে। এতে তাঁর আন্তরিকতা ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমার জানামতে এ গবেষণা কর্মের কোন অংশ কোন ডিগ্রি অর্জন কিংবা পুস্তক হিসেবে প্রকাশের জন্য কোথাও দেওয়া হয়নি।

অতএব এ গবেষণা কর্মটি এম. ফিল ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে মূল্যায়নের জন্য প্রেরনের সুপারিশ করা হল।

প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া
তত্ত্বাবধায়ক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমিনিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, "মিলিন্দ প্রশ্ন'গ্রন্থেরআলোকে বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্ব: একটিপর্যালোচনা"শিরোনামশীর্ষকঅভিসন্দর্ভটিআমারএম.ফিলডিগ্রি অর্জনের গবেষণাকর্ম। বিশ্ববিদ্যালয়েরনিয়মানুযায়ীআমিআমারগবেষণাকর্ম সমাপ্তকরেছি। এটিরপূর্ণ অথবাআংশিক কোন অংশ প্রকাশেরজন্য আমি কোথাওজমাকরিনি। এটিআমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

মোছা: ইনসেরে জেমী
এম.ফিলগবেষক
রেজি নং-১৯৫/২০১২-২০১৩
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজবিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"মিলিন্দ প্রশ্ন'গ্রন্থেরআলোকে বৌদ্ধ দর্শন তত্ত্ব: একটিপর্যালোচনা"শীর্ষকগবেষণাকর্মটিআমারজন্য খুবই দূরূহব্যাপারছিল। এই গবেষণাকর্মটিকরতেগিয়েআমিঅনেকেরনিকটঋণী। বিশেষকরেআমারপ্রিয়শিক্ষকএবংগবেষণাকর্মেরতত্ত্বাবধায়কবিশিষ্ট বৌদ্ধতত্ত্ববিদ প্রফেসর ড. সুকোমলবড়ুয়ারনিকটআমিচিরকৃতজ্ঞ। তিনিপ্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণাকর্মটিসমাপ্তকরারজন্য আমাকে যেভাবেপরামর্শ, উপদেশ ও তাগিদ দিয়েছেনতাকখনো ভোলারমতনয়। তিনিনাহলেআমার এ গবেষণা কর্ম শেষ করাকখনো সম্ভবপরহতোনা।এজন্য তাঁকেআমিআজগভীরভাবেস্মরণকরছি।

এছাড়াবিভাগেরঅন্যান্য সম্মানিতশিক্ষকগণওনানাভাবেআমাকেসহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন- অধ্যাপক ড. দিলীপকুমারবড়ুয়া, অধ্যাপক ড. রেলুরানীবড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. সুমনকান্তি বড়ুয়া, মিসেসনীরু বড়ুয়া ও শান্টুবড়ুয়া প্রমুখশিক্ষকগণ। এজন্য তাঁদেরকেআমিগভীর কৃতজ্ঞতাসহধন্যবাদ জানাই। আমারমামিসেসমাহমুদা বেগম ও বাবা মোঃআশিরউদ্দীনউভয়আমারউচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকর্মে আমাকেনানাভাবে প্রেরণাযুগিয়েছেনএবংআমার শ্রদ্ধেয় বড়ভাইনির্বাহীপ্রকৌশলীমোঃমাসুদ আলমদিন-রাতপরিশ্রমকরে যেভাবেআমারথিসিসজমা দেয়ারকাজেসহযোগিতাকরেছেনতা কৃতজ্ঞতাজানিয়েকখনো ঋণ শোধকরাযাবেনা। আমারবড় বোনমিসেসরুকসনা বেগম ও মেঝো বোনমিসেসরুমানা বেগমউচ্চশিক্ষাসহ এই গবেষণা কর্ম সম্পন্নকরারব্যাপারে সব সময়আমারপাশে থেকে নানাভাবেউপসাহ ও সাহায্যকরেছেন। আমারভাইপ্রভাষক ড. খন্দকারআশফাকুলমুঈদ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়এবংভাবীশাহীনআফরোজআমারউচ্চশিক্ষারব্যাপারেঅতীবআনন্দিত এবংসবসময় খোঁজ খবর নিয়েআমাকে প্রেরণাযুগিয়েছেন, নানাভাবেসহযোগিতাপ্রদানকরেছেন। এছাড়াআমার স্বজনপরিজন ও পরিবারেরঅন্যান্য আত্মীয়বর্গ আমারউচ্চশিক্ষাএবংগবেষণাকর্মেরব্যাপারেখুবইআগ্রহান্বিত ও প্রীতছিলেন। তাঁদের সকলের দোয়া ও শুভেচ্ছায়আমারআজএতটুকুঅর্জনহয়েছেএবংএম.ফিলডিগ্রিলাভেরপ্রত্যাশাকরছি। তাঁদের সকলেরপ্রতিরইলোআমারআন্তরিকধন্যবাদ।

এছাড়াআমার এই গবেষণাকর্মেরজন্য আমিধন্যবাদ জানাতেচাইবিভিন্নলাইব্রেরিরলাইব্রেরিয়ানদেরকে। তারাসাহায্য নাকরলেআমারগবেষণাকর্মেরমূল্যবান তথ্য-উপাত্ত ও প্রয়োজনীয় রেফারেন্সসংগ্রহকরাকখনো সম্ভবপরহতোনা। বিশেষকরেঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাএকাডেমী, পাবলিকলাইব্রেরিসহবিভাগীয় সেমিনারেরনানাবই-পুস্তক ও জার্নালপ্রভৃতিআমাকেবিশেষভাবেউপকৃত করছে। বিভাগীয়সকলকর্মকর্তাকর্মচারীওআমাকেনানাভাবেসাহায্য করেছে। এজন্য আমিতাদের নিকটও কৃতজ্ঞ। সর্বশেষ আমারথিসিস কম্পোজকরারকাজেআমাকেযারাসাহায্য করেছেনতাদের কথানাবললেইনয়। আমারসম্পূর্ণ কাজটিতেযাদের অবদানতারাহলেনসজিবভাই ও নজরুলভাই।তারাআমারজন্য অনেককষ্টকরেছেন। তাদেরজানাইধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষেবিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহঅফিসসংশ্লিষ্টসকলকেজানাইআমারগভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
ভূমিকা	ঃ		১-২
প্রথমঅধ্যায়	ঃ	মিলিন্দ প্রশ্নেরপরিচিতি	৩-১৬
দ্বিতীয়অধ্যায়	ঃ	আয়ুষ্মাননাগসেনএবংরাজামিলিন্দের জীবনকাহিনী	১৭-৩৩
তৃতীয়অধ্যায়	ঃ	‘মিলিন্দ প্রশ্ন’গ্রন্থেরমূলবিষয়বস্তু সম্পর্কিতপর্যালোচনা	৩৪-৫৬
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	‘মিলিন্দ প্রশ্ন’গ্রন্থে বর্ণিত বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্বেরব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা।	৫৭-৯৪
উপসংহার	ঃ		৯৫-৯৭
গ্রন্থপঞ্জি	ঃ		৯৮-১০১

ভূমিকা: মহামানব গৌতম বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো 'ত্রিপিটক' (Canonical Txets)। এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে পালি ভাষায়। পরবর্তীতে পালি ভাষা ও ত্রিপিটককে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বহু সাহিত্যিক গ্রন্থ। এর মধ্যে অন্যতম সাহিত্যিক কর্ম হলো ত্রিপিটক, ত্রিপিটক বহির্ভূত মৌলিক গদ্য গ্রন্থ (Non-Canonical Texts), অট্ঠকথা, টীকা, অনুটীকা, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, বংস সাহিত্য, সারগ্রন্থ, সংকলন গ্রন্থ, অধিবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ, সংকলিত গল্প সংগ্রহ, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, ছন্দ ও অলংকার, নীতিশাস্ত্র, গল্পগ্রন্থ, সাংঘিক বিধি-বিধান, জীবনীগ্রন্থ, ভবিষ্যদ্বুক্ত-সম্বন্ধীয়গ্রন্থ, চিকিৎসাশাস্ত্র, চিঠি ও অনুশাসন প্রভৃতি। ত্রিপিটকের পর এবং অট্ঠকথার পূর্ববর্তী সময়ে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন নিয়ে রচিত কতিপয় উন্নত, যুক্তিনির্ভর ও বিশ্লেষণধর্মী সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায়, যা পালি সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রিপিটক বহির্ভূত মৌলিক গ্রন্থ বা Paracanonical Texts হিসেবে স্বীকৃত। এ জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সুত্তসংগহ, পেটকোপদেস, নেত্তিপকরণ এবং মিলিন্দপঞ্হ। 'মিলিন্দপঞ্হ' গ্রন্থটির বাংলা হলো 'মিলিন্দ প্রশ্ন'। যা আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের কথোপকথনের মাধ্যমে বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্বের সারমর্ম ও ব্যাখ্যা উপমায় পরিপূর্ণ একটি ত্রিপিটক বহির্ভূত মৌলিক গ্রন্থ।

সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলন করেও ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। এই গ্রন্থের প্রশ্নগুলো তীক্ষ্ম, বুদ্ধিদীপ্ত ও জটিল এবং সমাধানগুলো বেশ বলিষ্ঠ ভাষায় যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'কথাবত্থু', 'বিশুদ্ধিমার্গ' ও 'সারসংগ্রহ' -এর মতো এ গ্রন্থের প্রামাণিকতা কোন অংশে কম নয়। এমন কি, আচার্য বুদ্ধঘোষ কোন কোন বিষয়ে তাঁর মত পরিস্ফুট করার জন্য বিশুদ্ধিমার্গের কয়েক স্থানে 'মিলিন্দ প্রশ্নের' প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। পরবর্তীকালে অনেক দার্শনিক, পণ্ডিত ও তাঁদের গ্রন্থে 'মিলিন্দ প্রশ্নের' উদাহরণ দিয়েছেন। বৌদ্ধ-দর্শনে এই গ্রন্থটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। প্রথম দিকে এই গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও বিগত আড়াই হাজার পর বুদ্ধের পরিনির্বাণ অব্দে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ সঙ্গীতি। এই ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে একে ত্রিপিটকের অন্তর্গত করা হয়েছে। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের মতোই 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থটি সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে রয়েছে মতভেদ। এর রচয়িতা, রচনাকাল ও রচনাস্থল নিয়েও রয়েছে বিশেষ বৈসাদৃশ্য। তবে ধারণা করা হয় গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রি.পূ: প্রথম শতক অথবা খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে। মূলগ্রন্থটি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। গ্রীক রাজা মিনান্ডার ও একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু আয়ুষ্মান নাগসেনের কথোপকথনের বর্ণনা পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে। উভয়েই ছিলেন পণ্ডিত ও জ্ঞানানুরাগী। বর্তমানে আমরা গ্রন্থটির যেই অনুবাদ গ্রন্থ পাই, তা অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় রূপান্তরিত।

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, বৌদ্ধ অনাত্মবাদ, জন্মান্তর, কর্মবাদ, নির্বাণের স্বরূপ, অর্হত্ত্বের লক্ষণ প্রভৃতি অনেক গম্ভীর বিষয়ের আলোচনার ভঙ্গী অতি সরস, হৃদয়গ্রাহী এবং সর্বজনবোধ্য করে তুলে ধরা হয়েছে। যে সমস্ত বিষয় বোধগম্য নয়, তেমন তত্ত্বগুলো উপদেশ ও নানা দৃষ্টান্ত, আখ্যায়িকা, উপমা প্রভৃতির

সাহায্যে এমনভাবে করা হয়েছে যে, যে কেউ তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে। মহামানব গৌতমবুদ্ধের আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ ও তাঁর পরম গন্তব্য লক্ষ্য নির্বাণ সম্বন্ধে সার্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

"মিলিন্দ প্রশ্ন" গ্রন্থের আলোকে বৌদ্ধ দর্শন তত্ত্ব নিয়ে এ পর্যন্ত দেশ-বিদেশে প্রচুর গবেষণা হলেও বাংলাদেশে তেমন কোন গবেষণা হয়নি বলা চলে, আবার যা কিছু আলোচনা হয়েছে তাও বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটা নতুন গবেষণাকর্ম বলা চলে, যেখানে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এ কাজটি করেছি। এতে বৌদ্ধ দর্শন-তত্ত্বের দুর্বোধ্য বিষয়গুলোকে সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে যাতে দেশ-বিদেশের বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষণা ও সুধি পাঠক সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারী সহায়ক ভান্ডার হবে বলে আমি মনে করি। ঐ আলোকেই আমার এ গবেষণা কর্মকে আমি চতুর্থ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সাজিয়েছি। নিম্নে অধ্যায়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো:

প্রথম অধ্যায়ে মিলিন্দ প্রশ্নের পরিচিতি সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে। তাতে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থটি কি জাতীয় গ্রন্থ এবং এর রচনাকাল, রচয়িতা এবং রচনাস্থলসহ ভাষাগত সাহিত্যিক মূল্য বিচার করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত, রাজা মিলিন্দের পরিচয়, মিলিন্দের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, নাগসেনের প্রব্রজ্যা, নাগসেনের অপরাধ ও দণ্ডকর্ম, নাগসেনের পাটলিপুত্রে গমন ও অর্হত্ব লাভ, আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের সাক্ষাৎকার প্রভৃতি বিষয়সমূহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দ সম্পর্কে সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে গ্রন্থের ছয়টি বিভাগ আলোচনাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় যেমন ধুতাঙ্গকথা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যা অভিসন্দর্ভটির সৌন্দর্য অনেকটা বৃদ্ধি করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে বর্ণিত বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্বের বাখ্যা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বৌদ্ধ দর্শনের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও দর্শন প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায়। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব, কুশল ধর্ম (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি), প্রজ্ঞা, শীল, সমাধি, দ্বাদশ নিদান (নাম-রূপ, ষড়ায়তন), চার আর্যসত্য, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, স্বপ্ন, বৌদ্ধ অনাত্মবাদ, প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা, জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, অর্হত্বের লক্ষণ, নির্বাণ প্রভৃতি বৌদ্ধ দর্শনসমূহ মিলিন্দ প্রশ্নের আলোকে যুক্তি উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরিশেষে একটি উপসংহার প্রদান করা হয়েছে যেখানে এ গবেষণা কর্মে আমার নিজস্ব মত উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্ব্শেষ মূল্যবান একটি গ্রন্থপঞ্জির তালিকা দিয়ে আমার অভিসন্দর্ভটি পরিসমাপ্তি করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মিলিন্দ প্রশ্নের পরিচিতি

বৌদ্ধ ধর্মীয় ত্রিপিটক বহির্ভূত পালি সাহিত্যে অদ্যাবধি আমরা যে সমস্ত গ্রন্থের পরিচয় পেয়েছি তার মধ্যে মিলিন্দ পঞহো বা মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থখানি অন্যতম। এ গ্রন্থখানি শুধু ধর্মীয় পুস্তক হিসেবে নয়, এর ভাব দর্শন প্রাচীন ভারতীয় মনীষার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে বিশ্বের পণ্ডিত সমাজ ও জ্ঞান পিপাসু পাঠক শ্রেণির নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। প্রাচ্য ভাষাবিদ Prof. T.W. Rhys Davids বলেছেন "ত্রিপিটক বহির্ভূত এটাই একমাত্র গ্রন্থ যা থেরবাদী বৌদ্ধদের নিকট অশেষ সমাদর লাভ করেছে। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত পণ্ডিত I. B. Horner যথার্থই মন্তব্য করেছেন–

"The Basis the approach and the Appeal of the Milinda Panho are on an intellictual and not a meditahonal Plane."[১]

গ্রন্থটির উৎপত্তিস্থল উত্তর পশ্চিম ভারতের কোন অঞ্চল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। Dr. T.W. Rhys Davids এর মতে, "মানব নামক কোন এক ব্রাহ্মণ যুবক গ্রন্থটির রচয়িতা।[২] তবে এ ব্যাপারে যথাযথ কোন সঠিক তথ্য তখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। মিলিন্দ হলেন খ্রি.পূর্ব ১ম শতকের ভারতীয় গ্রীক সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট সম্রাট। সুতরাং সম্রাট মিলিন্দের সাথে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে প্রশ্ন-উত্তর আকারে গ্রন্থটি রচিত বলে। তাই ভারতীয় পণ্ডিতসহ অন্যান্য পণ্ডিতগণ মনে করছেন এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রিস্টীয় ১ম শতকে।[৩]

এই গ্রন্থের প্রশ্নকর্তা মিলিন্দরাজ অলসন্দা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেদ, পুরান, দর্শন প্রভৃতি ১৯ প্রকার বিদ্যায় পারদর্শী এক বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক, পণ্ডিত ও তার্কিক ছিলেন। রাজা মিলিন্দ মহামানব বুদ্ধের কতগুলো দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতেন। যার জন্য তিনি তাঁর রাজ্যে যত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন সবাইকে প্রশ্নবানে পর্যূদস্ত করতেন। কিন্তু কেউ তাকে সদুত্তর দিতে পারেন নি। অবশেষে বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাপণ্ডিত ও তার্কিক আয়ুষ্মান নাগসেনের সাথে তাঁর আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতে বিভিন্ন বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সন্তোষ লাভ করেন এবং তাঁর সংশয়ের অবসান হয়। এই গবেষণা থেকে যা পাওয়া যায় তাতে বলা যায় যে, এই গ্রন্থটি যুক্তি ও তথ্য নির্ভর এবং এটি ভারতীয় মনীষার একটি উৎকৃষ্ট ফসল।

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থ

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব বিচার-বিশ্লেষণ ও সমাধান দেওয়াই এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এ গ্রন্থে ছয়টি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] যথা:

– পূর্বযোগ

– মিলিন্দ-প্রশ্ন

– লক্ষণ-প্রশ্ন

– মেন্ডক-প্রশ্ন

– অনুমান-প্রশ্ন

– উপমাকথা-প্রশ্ন।

এছাড়া 'বিমতিচ্ছেদন-প্রশ্ন' এবং 'মহাবর্গযোগিক্থা' এই দু'টি অবান্তর বিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। মিলিন্দের প্রশ্নসংখ্যা নিয়েও নানা রকম মতভেদ প্রচলিত। কোথাও এর সংখ্যা ৩০৪, কোথাও বা ২৬২, আবার কোথাও ১৭৫টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গ্রন্থটি যে পূর্বে অসমাপ্ত অবস্থায় ছিল এবং বিভিন্নকালে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ এবং প্রতিলিপি লেখনের ভিতর দিয়ে মূল গ্রন্থটি যেভাবে লিখিত হয়েছিল সেভাবে আর পাওয়া যায় নি। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মূল গ্রন্থের ভাষা কেমন ছিল, তা সম্পর্কেও নির্দিষ্ট কোন তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় নি। তবে মনে করা হয় সম্ভবত প্রথম দিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয় এবং পরবর্তীতে পালিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তবে সেই সময় কোন প্রাকৃত ভাষা হতেও এটি রূপান্তরিত হতে পারে। খ্রিস্টীয় তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এই গ্রন্থটি তিনবার চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। ব্রহ্মদেশ, সিংহল এবং শ্যামদেশেও এই গ্রন্থটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

মিলিন্দ প্রশ্নে ৬ মহাবগ্গযোগীর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বৌদ্ধ অনাত্মবাদ, জন্মান্তবাদ, কর্মবাদ, নিবার্ণের স্বরূপ, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গভীর আলোচনা এ গ্রন্থের গুরুত্ব ও গৌরব প্রসারিত করেছে।

বৌদ্ধধর্মের নানা তত্ত্বমূলক জটিল বিষয় উদাহরণ, উপমা ও রূপক গল্পের সাহায্যে সহজভাবে এবং কথোপকথনের মাধ্যমে যেভাবে এ জটিল তত্ত্বগুলো আলোচিত হয়েছে তা থেকে বলা যায় যে, ভগবৎ গীতার মত মিলিন্দ প্রশ্নও ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ধর্ম সঙ্গীতির অর্থকথা ও অর্থশালীনি গ্রন্থ অনুসারে প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচ প্রকার। যথা-

(১) অদৃস্ট প্রকাশন

(২) দৃষ্ট সংকুলন

(৩) বিমুক্তি ছেদন

(৪) অনুমোদন এবং

(৫) কথানেচ্ছা প্রশ্ন।

সমগ্র মিলিন্দ প্রশ্নে এই পাঁচ প্রকারের প্রশ্ন কথোপকথনের মাধ্যমে অতি সুন্দর ও সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে যে বর্ণ বিভাগ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র এ গ্রন্থে বর্ণ বিভাগ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কোন বর্ণের লোক কি কি বাহুর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাদের করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য কি কি তা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যা গ্রন্থটির সৌন্দর্য অনেকটাই বৃদ্ধি করেছে।

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থটি ধর্মীয় ভাবধারায় রচিত হলেও এর সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। প্রাচীন ভারতীয় সত্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যে সমৃদ্ধ। এ বিষয়ে T. W. Rhys David বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতীয় গদ্য সাহিত্যের ভান্ডারে মিলিন্দ প্রশ্ন উপাদেয় অবদান। আর তৎকালীন বিশ্বের যে কোন দেশে রচিত এ প্রকার গ্রন্থরাজির মধ্যে সাহিত্যিক দৃষ্টি ভঙ্গির দিক থেকে ইহা যথার্থই শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"

"মিলিন্দ প্রশ্ন" গ্রন্থটিতে তৎকালীন রাজন্যবর্গ থেকে শুরু করে জনপদ, প্রজাদের জীবন-প্রণালী, জাতভেদ প্রথা, নগর-বিন্যাস, অভিজাত শ্রেণি, নারী জীবনসহ বিভিন্ন মূল্যবান তথ্যের কথা উঠে এসেছে। আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের কথোপকথনের সময়, আয়ুষ্মান নাগসেন একাধিকবার রাজা মন্ধাতা, নিমি, রাজা সাধীন, বেস্সন্তর প্রভৃতি নৃপতিবর্গের উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ রাণী গোপাল মাতার বৎসরাজ উদয়নের পাটরাণী পদে অধিষ্ঠান, মল্লিকাদেবীর কোশল রাজ্যের অগ্রমহিষী হওয়ার বৃত্তান্ত ও কোশল রাজের অতুলনীয় দানের কথাও টেনে আনা হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধের সমসাময়িক রাজা উদেনের (উদয়নের) নামোল্লেখ করা হলেও কোশল রাজ পসেনদি বা প্রসেনজিতের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি এ সমস্ত রাজাদের রাজ্য বিস্তার, রাজ্যশাসন কিংবা যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে কোন প্রকার আভাস দেওয়া হয়নি। তবে মৌর্য সম্রাটদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মুদ্রারাক্ষস, জৈন পরিশিষ্টপর্ব, পুরাণ, কথাসরিৎসাগর, মিলিন্দপঞ্হ, মহাবংশটীকা প্রভৃতি গ্রন্থে সংরক্ষিত ঐতিহ্যগত বিবরণানুযায়ী মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং নন্দ বংশের উচ্ছেদ করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। এই যুদ্ধের কিছু তথ্য গ্রীকরাজ মিলিন্দের মুখনিঃসৃত বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে- "ভন্তে, নাগসেন, নন্দকুলস্স ভদ্দসালো নাম সেনাপতিপুত্তো অহোসি, তেন চ রঞ্ঞা চন্দগুত্তেন সঙ্গামো সমুপব্বুল্হো (সমুপব্বূঢ়হা) অহোসি'।"

সম্রাট অশোকের সমকালীন বা তাঁর অব্যবহিত পরবর্তীকালীন ত্রিপিটকান্তর্গত কোন পালি গ্রন্থে অশোকের নামোল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে পিটক-বহির্ভূত আদি স্তরের মিলিন্দপঞ্হ নামক পালি গ্রন্থে সর্বপ্রথম সম্রাট অশোকের নাম দেখা যায় এবং তাঁতে সুস্পষ্ট ভাষায়- "নগরে, মহারাজ, পাটলিপুত্তে অসোকো ধম্মরাজা" বলে অভিহিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী অশোক দিগ্বিজয়-নীতি পরিহার করে

ধর্মবিজয়-নীতি গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মনীতির জন্যই আজও তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। মিলিন্দ প্রশ্নের ঐরূপ উল্লেখ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে খ্রি. পূ. প্রথম বা খ্রিস্টোত্তর প্রথম শতকের মধ্যেই অশোক 'ধর্মরাজা' বলে প্রতিষ্ঠিত হন।

নাগসেনের দু-একটি উক্তি থেকে রাজার মন্ত্রীবর্গ সম্বন্ধে কিছু তথ্য অবগত হওয়া যায়। যেমন এক স্থানে বলা হয়েছে- রাজসভায় একশত কিংবা দুইশত অমাত্য থাকতে পারে; কিন্তু এঁদের মধ্যে কেবল ছয়জনই (আসল) অমাত্য হিসেবে গণ্য হন, যেমন- সেনাপতি, পুরোহিত, বিচারক (অক্খদস্স), কোষাধ্যক্ষ (ভণ্ডাগারিক), ছত্র গ্রাহক ও খড়্গ্ গ্রাহক (ছত্তগাহক, খগ্গগাহক)। এঁরা সকলেই রাজগুণযুক্ত; অন্যেরা অমাত্য হিসেবে গণ করা হয় না।

গ্রন্থটিতে নগর-বিন্যাস ও উন্নত মানের নাগরিক জীবন সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থের শুরুতে রয়েছে 'সাগল' নগরের বর্ণনা। একটি আদর্শ নগরের রূপ-বৈচিত্র্য ছাড়াও, নাগরিকদের যা কিছু প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে বর্ণিত হয়েছে। পালিগদ্যে রচিত এমন বিচিত্র বর্ণনা মিলিন্দ প্রশ্ন ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনিস (খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) সমসাময়িক পাটলিপুত্র নগরও রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন, তাকেও হার মানিয়ে দেয়। মহাজনক জাতকের গাথায় রচিত মিথিলা নগরীর মনোহর বিবরণের সাথে মিলিন্দপঞ্হো গ্রন্থের সাগল নগরীর তুলনা করা যায়।

নগরীতে যে সকল নাগরিক বাস করতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। এছাড়াও অন্যান্য অনেক অন্ত্যজ জাতির লোকের বাস ছিল যারা কোন হীন শিল্প আশ্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই সমস্ত লোক সকলেই নগরের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। তবে এদের সামাজিক স্থান বা অবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়নি। তবে মিলিন্দ প্রশ্নের দু-একটি অনুচ্ছেদে বর্ণ-বিভাগ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়রা ছিল পরাক্রমশালী। প্রথমেই ক্ষত্রিয়দের স্থান দেওয়া হয়েছে, এর পরে এসেছে ব্রাহ্মণদের নাম। ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্যই তৎকালীন সমাজে স্বীকৃত সত্য হিসেবে সকলেই মেনে নিয়েছিল। ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে মিলিন্দ প্রশ্নে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়; তা হলো এঁদের ধর্ম কর্ম বিষয়ক জ্ঞান। রাজপুত্রগণের (ক্ষত্রিয়দের) পক্ষে যেমন হস্তবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, মুদ্রা, গণনা প্রভৃতি নানা বিদ্যার অনুশীলন, অসিচালনা, যুদ্ধ করা, সৈন্য সঞ্চালন করা প্রভৃতি কর্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য; তেমনি ব্রাহ্মণ কুমারগণের পক্ষে চারি বেদসহ অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন অবশ্য কর্তব্যের বিষয়। মিলিন্দ প্রশ্নের মূল গ্রন্থে পাওয়া যায়- "অবসেসানং পুথুবেস্ সসুদ্দানং, কসি, বণিজ্জা, গোরক্খা করণীয়া।" অর্থাৎ অবশিষ্ট বৈশ্য ও শুদ্রদের কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন ইত্যাদি অবশ্য করণীয়।

এই গ্রন্থের কয়েকটি উদ্বৃতাংশ তৎকালীন প্রচলিত কঠোর দণ্ডবিধির উপর আলোকসম্পাত করে। যেমন একটিতে রয়েছে লম্বা তালিকা- "যে সমস্ত লোক প্রাণী হত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যা বলে, লুণ্ঠন করে, পথে ডাকাতি করে, জুয়া চুরি করে, প্রতারণা করে এদের উপর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সেই পাপ

কাজের জন্য তাদের কশাঘাত করা হয়, বেত্রাঘাত করা হয়, মুদ্গরাদি দণ্ড দ্বারা প্রহার করা হয়, হাত কেটে ফেলা হয়, পা কেটে ফেলা হয়, হাত-পা কেটে ফেলা হয়, কান কেটে নেওয়া হয়, জীবন্ত শূলে দেওয়া হয়, অসি দ্বারা শিরচ্ছেদ করাসহ প্রভৃতি শাস্তি ভোগ করতে হয়।

মিলিন্দ প্রশ্নে নারী জীবন সম্বন্ধেও বিভিন্ন তথ্য চিত্র পাওয়া যায়। আসুর বিবাহ বা Marriage by purchase (অর্থাৎ কন্যা পক্ষকে শুল্ক বা কন্যার মূল্য স্বরূপ অর্থ দিয়ে কন্যা ক্রয় করে যে বিবাহ পদ্ধতি) প্রচলন সম্বন্ধে কিছুটা আভাস একটি উপমার সাহায্যে পাওয়া যায়।[৫] যেমন, কোন এক ব্যক্তি বিবাহের জন্য অগ্রিম অর্থ দিয়ে একটি ছোট বালিকাকে নির্বাচন করে চলে যায়। (কোচিদেব পুরিসো দহরিং দারিকং বারেত্বা সূস্কং দত্বা পক্কমেষ্য); ক্রমশঃ ঐ বালিকাটি বয়ঃপ্রাপ্তা হলে পাত্রী পক্ষকে পণ দিয়ে অপর এক ব্যক্তি যুবতী অবস্থায় ঐ মেয়েটির সঙ্গেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। অতঃপর প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে উক্ত কন্যাকে ভার্যা বলে দাবি করে এবং উভয়ের মধ্যে বাক-বিতন্ডার ফল স্বরূপ ঘটনাটি রাজার বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে। এ উপমা থেকে অনুমান করা যায়, তৎকালীন সময়ে বাল্য বিবাহও পণ বিবাহ প্রচলিত ছিল।

বিধবা জীবন যে চরম অভিশাপের জীবন ছিল তা আয়ুষ্মান নাগসেনের উক্তিতে প্রকাশ পায়।

নাগসেন সংসারে দশ প্রকার অবজ্ঞাত, অবহেলিত, অমর্যাদা প্রাপ্ত লোকের উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম বিধবা নারীর কথা স্মরণ করেছেন এবং এই তালিকায় বিধবার সাথে রয়েছে নয় প্রকার মানুষ। যথা: দুর্বল পুরুষ, জাতি-মিত্রহীন ব্যক্তি, পেটুক, গুরুহীন কুলোদ্ভব ব্যক্তি, কুসঙ্গীযুক্ত ব্যক্তি, ধনহীন ব্যক্তি, সদাচারহীন ব্যক্তি, নিষ্কর্মা লোক, উদ্যোগহীন ব্যক্তি। এরা সকলেই পৃথিবীতে চিরকাল অবহেলিত ও অসম্মানিত হয়ে আসছে। ব্যভিচার দোষে দুষ্টা নারী সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন কোন সধবা স্ত্রী অগোচরে আত্মগোপন করে পরপুরুষ সেবা করে, এমনকি স্বামীর সম্মুখেই পরপুরুষ সেবা করে, তাহলে স্বামী ইচ্ছানুযায়ী তাকে প্রহার করতে পারে, বধ করতে পারে, বন্ধ করতে পারে, দাসীতে পরিণত করতে পারে। এমনকি কঠোর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা সমাজে স্বীকৃত সত্য বলে একস্থানে উল্লেখ আছে। মিলিন্দ প্রশ্নে অমরাদেবী কাহিনীতে এসব চিত্রের বিপরীত রূপ ফুটে উঠেছে, অমরাদেবী ছিলেন চরিত্রবতী নারী। নিরালা গ্রামে একাকী বাস করার সময় সহস্র মুদ্রার প্রলোভনেও তিনি স্বামীকে ভালবাসার কারণে পাপ কর্মে সম্মত হননি।

তখনকার দিনে অভিজাত উচ্চকোটি সমাজে কিছু নৈতিক আদর্শ ছিল। যেমন গণিকা বৃত্তি হীন বৃত্তি বলে গণ্য করা হত। তারপরও কোন কোন গণিকা নৈতিক গুণাবলীর জন্য সমাজের উচ্চ স্তরের যথেষ্ট মর্যাদা ও শ্রদ্ধা লাভ করতেন; এমনকি রাজা-মহারাজাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হতেন। যেমন- ধর্মরাজা অশোকের সময় পাটলিপুত্র নগরের "রূপোপজীবিনী" বিন্দুমতীর ছোট্ট কাহিনীটি উল্লেখ করা যায়। বিন্দুমতী নিকৃষ্ট গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেও সত্যক্রিয়ার অপূর্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা রাজা অশোকের সম্মুখে দেখিয়ে ধর্মরাজকে মুগ্ধ করেছিলেন।

সমাজ জীবন সংক্রান্ত আর একটি মূল্যবান তথ্যের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মিলিন্দ প্রশ্নে' তৎকালীন প্রচলিত লোকাচার সম্বন্ধীয় যে তথ্যটি নাগসেন বলেছেন, তা থেকে জানা যায় যে পিতা নিজের ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে নিজের প্রিয়তম পুত্রকেও বন্ধক দিতেন কিংবা বিক্রয় করতেন। এটি সমাজের কাছে তেমন নিন্দনীয় বিষয় ছিল না।

প্রাচীন ভারতে যে শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা সম্পর্কে মিলিন্দ প্রশ্নে খুবই তথ্যবহুল বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- রাজকুমারদের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল শ্রুতি, সম্মুতি (স্মৃতি), সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, গণিত, সঙ্গীত (গন্ধব্বা), চিকিৎসা, চর্তুবেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, যাদুবিদ্যা (মায়া), হেতু বা তর্ক, মন্ত্রণা, যুদ্ধ বিদ্যা, ছন্দ বা কাব্য, মুদ্রাজ্ঞান প্রভৃতি। রাজকুমারদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন রাজপুরোহিতগণ। এছাড়াও কজঙ্গলের সোনুত্তর ব্রাহ্মণ তাঁর সাঁত বছর বয়সের পুত্র নাগসেনের জন্য সহস্র মুদ্রা গুরু-দক্ষিণা দিয়ে কোন ব্রাহ্মণ আচার্যকে নিযুক্ত করেছিলেন। মিলিন্দ প্রশ্নে ত্রিবেধ শিক্ষা ছাড়াও শিল্প শিক্ষা, ধনুবিদ্যা, শিক্ষণ প্রণালী ও আয়ুর্বেদকে বিস্তর তথ্য পাওয়া যায়।

'মিলিন্দ প্রশ্নে' জনপদ, নগর, নদী এবং বিদেশ সম্পর্কেও বহু তথ্যের উল্লেখ দেখা যায়। নদী সম্পর্কে নাগসেনের একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য- "হিমালয় পর্বত থেকে পাঁচশত নদী প্রবাহিত হয়। কিন্তু এদের মধ্যে দশটি নদী বলে গণ্য হয়, যথা- গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভু, মহী, সিন্ধু, সরস্বতী, বেত্রবতী, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা। অন্যান্যগুলো নিত্যসলিলা নয় বলে নদী বলা যায় না। এছাড়াও 'উহা' নামক হিমালয়ের আরও একটি নদীর নাম পাওয়া যায়। যা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নি।

সমুদ্র বাণিজ্য সম্পর্কেও মিলিন্দ প্রশ্নে বিভিন্ন উপমা পাওয়া যায়। যেমন- কোন ধনবান নাবিক বন্দরে নির্দিষ্ট শুল্ক দিয়ে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে বঙ্গ (সুমাত্রার পূর্বে অবস্থিত বঙ্গদ্বীপ), তক্কোল, চীন, সৌবীর, সুরাষ্ট্র, অলসন্দ (Alexandria), কোলপট্টন অথবা সুবর্ণভূমি (নিম্ন ব্রহ্মদেশ এবং থাইল্যান্ড) এবং অন্য যে কোন নৌকা সঞ্চরণ স্থানে গমন করে। নগরের বাসিন্দাদের উল্লেখ করতে গিয়ে আয়ুষ্মান নাগসেন অনেক দেশ-বিদেশের নাম করেছেন- "শক-যবন, চীন-বিলাত (চিলাত), উজ্জয়িনী, ভরুকচ্ছ, কাশী-কোশল, অপরান্ত, মগধ, শাকেত, সৌরাষ্ট্র, পাঠ্যে, কোটুম্বর, মথুরা, অলসন্দ, কাশ্মীর-গান্ধার।

দুঃখ, অনাত্মা, কর্মবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্বগুলো এতো দৃঢ়তার সাথে এবং সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে যে, প্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ মিলিন্দ প্রশ্নকে পিটক গ্রন্থের তুল্য মর্যাদা সম্পন্ন বলে অভিহিত করেছেন।[৫] বহু দার্শনিক, পণ্ডিত তাঁদের গ্রন্থে মিলিন্দ প্রশ্নের উদাহরণ ও উদ্বৃতি দিয়েছেন। আচার্য বুদ্ধঘোষ কোন কোন বিষয়ে তাঁর মতামত পরিপুষ্ট করার জন্য বিশুদ্ধিমার্গের কয়েক স্থানে মিলিন্দ প্রশ্নের সাহায্য নিয়েছেন।

এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের যে সকল গভীর ও জটিল তত্ত্বের সমন্বয় ঘটেছে আর অন্য কোন গ্রন্থে তা হয়নি। সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্র গবেষণা ও অনুশীলন করেও এ গ্রন্থের গভীর ভাবগাম্ভীর্য ও তত্ত্ব উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। এই

গ্রন্থে প্রশ্নকর্তা যেভাবে নিজের তীক্ষ্মতা ও প্রজ্ঞার সাথে জটিল প্রশ্নগুলো করেছেন, তেমনি ভদন্ত নাগসেনও নিজের তিক্ষ্মতা ও পাণ্ডিত্যের সাথে বেশ বলিষ্ট ভাষায় সুস্পষ্টভাবে যথাযথ তার উত্তর দানে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং জীবন ও জগতকে জানতে দুঃখ মুক্তির পথ অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করতে এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে মিলিন্দ প্রশ্নের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করেছেন যে "কোন একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে যারা প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে প্রয়াসী হন, তাদের পক্ষে বিশ্বের পুস্তক ভান্ডার হতে মিলিন্দ প্রশ্ন অধ্যয়ন ব্যতীত অপর কোন উপাদেয় গ্রন্থ নেই।"

রচয়িতার পরিচয়

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থের রচয়িতার পরিচয় নিয়ে পণ্ডিত মহলে মধ্যে বেশ মত পার্থক্য রয়েছে। পণ্ডিত গণের ধারণা, বর্তমানে পাওয়া 'মিলিন্দপঞ্হ' নামক গ্রন্থটি অন্য কোন মূল ধর্ম গ্রন্থের রূপান্তর মাত্র বা পরিমার্জিত রূপ। ধারণা করা হয় মূল ধর্মগ্রন্থটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষায় কিংবা উত্তর ভারতের কোন এক আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়।[৬] তবে বর্তমানে সেই মূল গ্রন্থের কোন লিপি আবিস্কৃত হয়নি। এই গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন তথ্য এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। মূলত গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। এখন পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক এমন কোন তথ্য আমাদের সামনে আসেনি যার ভিত্তিতে এই বিখ্যাত অমূল্য গ্রন্থটির রচয়িতার নাম জানা সম্ভব হয়। যেহেতু এটি একটি প্রাচীন গ্রন্থ, রচনা পদ্ধতি উচ্চমানের ও বিশুদ্ধ এবং উত্তর ভারতীয় কোন ভাষায় এটি রচিত হয়েছে। তাই পণ্ডিত মহলের অনেকে ধারণা করেন যে, গ্রন্থটির রচয়িতা নাগার্জুন। যিনি বৌদ্ধ সাহিত্যে বৌদ্ধ দার্শনিক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু মাধ্যমিক দর্শনের সাথে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থের বিষয় বস্তুর মধ্যে বিস্তর মত পার্থক্য। আর বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন যিনি মাধ্যমিক শূন্যতাবাদের জনক, তিনি কেন এরূপ স্বীয় মতবাদ বিরোধী গ্রন্থ রচনা করবেন? তাই অনেকের মত আমিও এ মতের সাথে একমত নই। এটি সম্পূর্ণ কল্পনা ও অযৌক্তিক।

প্রচলিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় যে, মিলিন্দ রাজ প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ছিলেন না। পরবর্তীতে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী হন। রাজা মিলিন্দের মৃত্যুর পর তা দীর্ঘদিন লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা কিছুতেই এক শতাব্দীর বেশী স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না। এছাড়াও বুদ্ধঘোষ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বিশুদ্ধিমার্গে মিলিন্দ প্রশ্নের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিজের নিগূঢ় ভাব-গাম্ভীর্য তত্ত্ব সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করার জন্য তিনি মিলিন্দ প্রশ্নের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই এ হতে ধারণা করা যায় যে, মিলিন্দ প্রশ্নের লেখক যিনি হবেন; তিনি খুব সম্ভবত: মিলিন্দ রাজের সময়কাল হতে বুদ্ধঘোষের পূর্ববর্তী কোন এক সময়ের লেখক হবেন। অর্থাৎ খ্রিস্টীয় প্রথম হতে চতুর্থ শতাব্দীর লোক হবেন। তা যাই হোক গ্রন্থকারের নাম ও পরিচয় জানা না থাকলেও Mrs. Rhys Davids তাঁর গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে একজন ব্রাহ্মণ যুবককে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থের রচয়িতা/গ্রন্থকর্তা রূপে উপস্থাপন করেছেন।[৭] তাঁর এই প্রয়াস ও যুক্তিপূর্ণ তথ্য সত্যিই কিছুটা রচয়িতার আভাস আনে। এই ব্রাহ্মণ যুবক প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায়

শিক্ষা লাভ করে। বিশ্ব বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্র নালন্দার আশ্রয়ে থেকে বৌদ্ধ শাস্ত্রাধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং সঠিক সময়ে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মিসেস রিস ডেভিডস্ এঁর একটি কল্পনাশ্রয়ী নামও দিয়েছেন 'মাণব'। যার সংস্কৃতিতে অর্থ 'ব্রাহ্মণ যুবক'। এ সম্বন্ধে মিসেস রিস ডেভিডস্ বলেছেন "And since the child must have a name, and any young Brahmin was called Manava a word which also appears to have served as a proper name- I propose to refer to him straight way as Manava. By some felicitous coincidence of fate or design, it may possible have actually been his name may be so still." অর্থাৎ- ইনি সাগল বা সাগল নগরের নিকটবর্তী কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষান্তে ব্রাহ্মণ তনয় মানব স্বদেশ (সাগল, বর্তমান শিয়ালকোট বা নিকটবর্তী কোন অঞ্চলে) ফিরে এসে কর্মক্ষেত্র সংসার জীবনে প্রবেশ করেন; জীবিকা নির্বাহের জন্য লেখকের কাজই তিনি বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এইরূপ বৃত্তিধারী লোকেরাই বোধহয় 'মিলিন্দপঞ্ঞহে' লেখাচার্য বলে অভিহিত হয়েছেন। তাঁর লেখার খ্যাতি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশ: তাঁর যশ, প্রতিপত্তি, খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। আর সেই কারণেই মিলিন্দ প্রশ্নের মত এরূপ একটি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করতে সক্ষম হন। রাজা মিলিন্দ ছিলেন গ্রীক ও প্রাকৃত ভাষায় অভিজ্ঞ। আর রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা রাজ দরবারের কোন রাজ কর্মচারীর লেখকের দ্বারা প্রাকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। মিলিন্দ রাজের পরবর্তী উত্তরাধীকারী হন রাজা Dionysios। তাঁর রাজত্বকালে ঐ সংক্ষিপ্ত (প্রাকৃতে রচিত) লিপি সংগ্রহকে, Notes এর আকারে গ্রন্থাকারে পূর্ণাঙ্গীন সাহিত্য-রূপ দেওয়ার আহ্বান পেয়ে তিনি এই গ্রন্থের সম্পাদনা ও রচনার কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। মাণব তাঁর এই গ্রন্থটি তিনটি কিস্তিতে প্রণয়ন করেন।

প্রথম কিস্তিতে সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ মিলিন্দ নাগসেনের কথোপকথনের বিষয় বস্তু পরিবর্ধিত হয়ে সাহিত্যের রূপে পর্যবসিত হয়।[৮] দ্বিতীয় কিস্তিতে মেন্ডক-পঞ্হ (মেন্ডক-প্রশ্ন) থেকে আরম্ভ করে অনুমাণ-পঞ্হের পূর্বাংশ পর্যন্ত লেখাগুলি সমাপ্ত হয়।[৯] অনুমাণ প্রশ্ন থেকে অবশিষ্টাংশ (ধর্মনগর, ধুতাঙ্গ কথা, উপমাকথা-প্রশ্ন প্রভৃতি তৃতীয় কিস্তিতে রচিত হয়।[১০] দ্বিতীয় কিস্তিতে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয় তা মাণবের নিজস্ব রচনা। এইভাবে কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ সন্তান মাণব গ্রন্থখানির প্রণয়নকার্য সম্পন্ন করেন। তিনি বলেছেন গ্রন্থটি রচিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। Mrs. Rhys Davids আরও মনে করেন, গ্রন্থের 'বাহির কথা' অংশ এবং সমাপ্তি সূচক অংশ সম্ভবত সিংহল দেশে সংযোজিত হয়।

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে এতে যেসব এলাকা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশ হচ্ছে নদ-নদী পাঞ্জাব ও তৎসীমান্তবর্তী কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল। তাই এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, মিলিন্দ প্রশ্নের লেখক পাঞ্জাব অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।

রচনাকাল নির্ণয়

মিলিন্দ প্রশ্নের সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে, রাজা মিলিন্দ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি খ্রিঃ পূর্বঃ ১৪০ হতে খ্রিঃ পূঃ ১১০ সাল পর্যন্ত সাগল নগরে (বর্তমানে মধ্য পাঞ্জাবের শিয়ালকোট) রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের মধ্যভাগে কোনও এক সময়ে তিনি আচার্য নাগসেনের সাথে মিলিত হন এবং জীবন ও জগত সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করেন। তাদের এই কথোপকথনই পরবর্তীতে মিলিন্দ প্রশ্ন নামে খ্যাতি লাভ করে। বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত আচার্য বুদ্ধঘোষ প্রমুখ অর্থকথাকারগণ তাঁদের রচনায় মিলিন্দ প্রশ্ন হতে যেভাবে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, তাতে মনে হয় গ্রন্থখানি মনীষীগণের নিকট খুবই উৎকৃষ্ট ও মহামূল্যবান। এ গ্রন্থের নাম যেমন অজ্ঞাত, তেমনি রচনা কালও সুনিশ্চিতভাবে জানার উপায় নেই। তবে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ মহলের প্রচলিত সাম্প্রতিক মতামত হলো এটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বা তার কিঞ্চিত পূর্ববর্তী সময়ের রচনা। অনেকে ধারণা করেন যে, আচার্য বুদ্ধঘোষের সিংহল গমনের তিনশ হতে চারশ বছর পূর্বেই এ গ্রন্থের সংকলন কার্য সমাপ্ত হয়েছিল। মিলিন্দ প্রশ্নের রচনাকাল নির্ণয়ে দু'ধরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা:-

- বাহ্য প্রমাণ
- ও আন্ত প্রমাণ

বাহ্য প্রমাণ: রাজা মিলিন্দ ও ব্যাকট্রেয়ার রাজা মেনেন্দার যদি নিঃসন্দেহে অভিন্ন বলে স্বীকৃত হন, তবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মৌলিক এই গ্রন্থটি খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি অপেক্ষা প্রাচীন নয়। কারণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই মিলিন্দরাজ খ্রিঃ পূঃ প্রায় ১৪০ অব্দ হতে ১১৫ বা ১১০ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর অন্তত এক শতাব্দী পরে গ্রন্থখানি রচিত হয়। অনেকে আবার ধারণা করেছেন যে, রাজা মিলিন্দ সিংহলে গমন করেছিলেন এবং সিংহলেই এই গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু তা প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব ধারণা। আমরা যেই মিলিন্দ গ্রন্থখানি বর্তমানে পেয়ে থাকি তা কেবল অনুবাদ গ্রন্থ, মূল গ্রন্থ নয়। খুব সম্ভবত মূল গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত ছিল এবং নিশ্চয়ই উত্তর ভারত হতে আহৃত হয়ে থাকবে। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর রচনাবলী লিখেছেন ৪৩০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সমগ্র রচনায় নূন্যধিক চারবার উদ্বৃতিসহ এই গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। ধারণা করা হয় বুদ্ধঘোষ যখন তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করছিলেন, তখন হয়ত 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থটি তাঁর সামনে ছিল। এটি সেই সময়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

আন্ত:প্রমাণ:

প্রখ্যাত বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ ও সুপণ্ডিত অধ্যাপক টি. ডাব্লিউ. রিস. ডেভিডস এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থটি পালি ত্রিপিটকের পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। কারণ এতে প্রতীয়মান হয় যে, মিলিন্দ প্রশ্নের গ্রন্থকার পালি ত্রিপিটকের বহুসংখ্যক অংশের উদ্বৃতি এতে সংযুক্ত করেছেন। তাই এটি ত্রিপিটক বহির্ভূত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

মহামানব গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁর পরিনির্বাণের পরে মিলিন্দ ও নাগসেনের জন্ম সম্পর্কে। খ্রিঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের কাল বিবেচনা করে এটা অনুমান করা যায় যে, উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের জন্ম হয়েছিল খ্রিঃ পূঃ ৪৩ অব্দে। তাঁদের জন্ম বিকাশের অনুকূলে আরও ৪০ বছর যুক্ত করে আমরা বিবেচনা করতে পারি, উভয়ের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে। গ্রন্থ সংকলনের কাল নিরূপণের নিমিত্তে এর সাথে আরও একশ বছর যোগ করে খ্রিস্টিয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তবর্তী কালকে রচনাকাল রূপে নির্ধারণ করলে বোধহয় আমাদের পক্ষে অবিবেচনা প্রস্তুত হবে না।

প্রফেসর রীস ডেভিড্‌সের মতে, এই গ্রন্থটি একদিকে যেমন ত্রিপিটকের পরে এবং অর্থকথার পূর্বে রচিত অন্য দিকে তেমনি এটি একমাত্র গ্রন্থ যা উত্তর ভারতে রচিত হলেও দক্ষিণ ভারতীয় বৌদ্ধদের কাছে সমানভাবে সমাদর লাভ করেছে। ত্রিপিটক বহির্ভূত অন্য কোন গ্রন্থ তাদের কাছে এমন মর্যাদা লাভ করেনি। প্রফেসর সিলভেন লেভি দেখিয়েছেন যে, মিলিন্দ প্রশ্ন খ্রিস্টীয় ৩২৭ অব্দ হতে ৪২০ অব্দের মধ্যে চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়। এ কারণে এর রচনাকাল পূর্বের সময়ের আরো পূর্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিলিন্দ প্রশ্নের লেখক সম্ভবত: গ্রীক রাজা মিনান্দারের সমসাময়িক অথবা তার মৃত্যুর কিছুদিন পরে জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। গ্রন্থের রচনাকাল এই সময়ের খুব বেশি পরে হওয়ার কথা নয়। কারণ গ্রীক রাজত্ব পাক ভারতে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। আমরা যদি গ্রীক রাজত্ব ভারতে এক শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছে বলে ধরে নেই। তবে এই গ্রন্থের রচনাকাল দাঁড়ায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী।[১১] কিন্তু এই তারিখ সমস্ত গ্রন্থের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না। কেবল প্রথম খন্ডের ভূমিকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রাচীন ও প্রামাণ্য। এতে দেখা যায় পুস্তকের বেশির ভাগ অংশ বহুদিন পরে রচিত হয়। তবে তা সম্ভবত: এক সাথে লিখিত হয় নি। এর প্রধান কারণ চতুর্থ হতে সপ্তম খণ্ড চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায় নি। শেষের অংশের রচনা পদ্ধতি পূর্বের অংশের চেয়ে আলাদা। তৃতীয় খণ্ডের শেষে গ্রন্থের উপসংহার নিয়ে আসা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডের প্রথমে আবার নতুন করে ভূমিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, প্রথম খণ্ডের ভূমিকাসহ কিছু অংশ, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড একসঙ্গে রচিত হয়। গ্রন্থটি সম্ভবত: প্রথম শতাব্দীর রচনা।[১২] পুস্তকের বেশির ভাগ অংশ যেমন চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম খণ্ড পরবর্তীকালের রচনা এবং ধারণা করা হচ্ছে সম্ভবতঃ বিভিন্ন সময়ে একাধিক লেখকের রচনা মূল গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং মিলিন্দ নরপতি খ্রিঃ পূঃ ১৪০ হতে ১১০ পূর্বাব্দে পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের মধ্যভাগে তিনি আচার্য নাগসেনের সাথে মিলিত হন এবং প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন। আনুমানিক খ্রি. পূঃ ১২৫ অব্দে) অনেকে ধারণা করেন সম্ভবত স্থবির নাগসেন এই 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক উপাদেয় গ্রন্থখানা রচনা করেছিলেন।

রচনাস্থল

'মিলিন্দ প্রশ্নে'র রচয়িতা ও রচনাকাল নিয়ে যেমন মত পার্থক্য রয়েছে তেমনি এর রচনাস্থল নিয়েও রয়েছে বিভিন্ন অনৈক্য। দীর্ঘ ৩৬ বৎসর রাজত্বের পর ১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্রাট পূষ্যমিত্রের মৃত্যু হয়। তৎপর উত্তর ভারতের শাসনকর্তা ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজাদের মধ্যে মিলিন্দ (Menander) ছিলেন অন্যতম ও প্রতিপত্তিশালী। তাঁর রাজ্যের পরিসীমা ছিল পাঞ্জাবের এক বৃহত্তর অংশ হতে আরম্ভ করে গান্ধার পর্যন্ত, যা বর্তমানে পেশোয়ার নামে পরিচিত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রত্যন্তবাসীদের দেশ। সিন্ধুর কিছু অংশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দংশ পর্যন্ত তিনি রাজ্য বিস্তার লাভ করেন। রাজা মিলিন্দের রাজধানী ছিল সাগল নগর।[১৩] এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডেমোট্রিয়াস এবং পিতার নাম অনুসারে নাম রাখেন ইউসিডেমোস। বর্তমানে এর অবস্থান সাগল বা শিয়ালকোটে, এটি ছিল অপূর্ব সৌন্দর্য্যের আধার। এর চারপাশে ছিল রমনীয় ভূ-প্রদেশে নদী, পর্বত, চৈত্য, উদ্যান, উপবন, তড়াগ ও পুস্করিনী। যোনক দেশের বিখ্যাত নগরী সাগল বা সাকল দেশের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র।[১৪] এর পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছিল গিরি নদী। যা ছিল অতি সুদৃশ্য বনরাজিতে পরিপূর্ণ। এছাড়াও এর সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সুশোভিত উদ্যান লতাকুঞ্জ বেষ্টিত প্রাকৃতিক হ্রদ, পুস্করিনী রয়েছে। এই অপার সৌন্দর্য্যের আধার সাগল নগরী ছিল অপূর্ব এক স্বর্গীয় নগরী। নগরীর অভ্যন্তরে ছিল সুউচ্চ স্থাপত্য কীর্তি, যা নগরীর অনেকটাই রাজকীয় সৌন্দর্য বৃদ্ধি সাধন করত। নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিপুণ ও সুরক্ষিত। প্রতিরক্ষা কাজে অসংখ্য বীর সেনানী নিযুক্ত ছিল। বিবিধ রাজকীয় প্রাসাদ ছিল যা সুদৃঢ় দুর্গ, উঁচু তোড়ন এবং শ্বেত প্রাচীরে বেষ্টিত। এর ভিতরের যে সব রাস্তা ছিল তা ছিল অতি বিস্তৃত ও সুপ্রশস্ত। রাজপথে সর্বদা নানা প্রকার যানবাহনের চলাচল ছিল। যেমন হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি। এর যে সুপ্রশস্ত রাস্তা ছিল তা সর্বদা পুষ্প দ্বারা সজ্জিত থাকতো। যা নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

রাস্তার পাশে মধ্যে মধ্যে বিপনী কেন্দ্র পরিলক্ষিত হত, যা হাজারো ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নগরীর শোভা বর্ধন করত। এই সব বিপণী কেন্দ্রে সব রকমের জিনিসপত্র পাওয়া যেত। যেমন বানারসী, মসলীন ও আরও কত মূল্যবান পোষাক ও দ্রব্য সামগ্রী। এর থেকে ধারণা পাওয়া যায়, নগরীর জীবন-যাপন অত্যন্ত উন্নত ছিল। এর ভিতরে যেসব খাবারের দোকান ছিল তা রসন তৃপ্তিকর বিভিন্ন পদের মিষ্টি, মিষ্টান্ন সন্দেস এবং সুগন্ধি পুষ্পমাল্যের দ্বারা মনোরমভাবে সুসজ্জিত ছিল। সব রকমের সব বর্ণের মানুষের আবাসস্থল ছিল এই রাজধানী। ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী, শ্রমিক, দিনমজুর প্রভৃতি বিভিন্ন নাগরিক বাস করতো এবং রাজপথ সমূহ সর্বদা সমাকীর্ণ থাকত। এই নগরীর আকাশ-বাতাস মুখরিত থাকত সুন্দর নর-নারীর গুঞ্জন কলহাস্যে। রাজ্যের কোষাগারসমূহ সর্বদা ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ থাকত। যার মধ্যে ছিল কহাপন, স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান প্রস্তর, মনি, রত্ন, হীরা, বহু ধন ধান্য ও মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী। ইতিহাসে সাগল নগরীকে তুলনা করা হয়েছে উত্তর কুরুর সাথে। যা ছিল উত্তর কুরুর মতই সমৃদ্ধশালী। আর এর সৌন্দর্য্যের অপার মহিমা ছিল দেব নগরী অলকনন্দের মত দৃষ্টিগোচর। সাগল নগরীর ভৌগোলিক বিবরণ হতে যা পাওয়া যায়, তাতে বর্তমানে দেখা যায় পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশস্থ ঝং

জেলার বর্তমানে 'সনগ্লয়ল টিবা' নামে পরিচিত। প্রাচীন সাগল নগরী ছিল মদ্দ (সংস্কৃত-মদ্র) দেশেরই রাজধানী।[১৫] খ্রিঃ সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সাগল নগরী পরিদর্শন করেন।[১৬] তার কাছে তা 'শি-কি-লো' নামে পরিচিত। পরিব্রাজক নগরটিকে ভগ্নদশায় লক্ষ্য করেন। তিনি দেখতে পান নগরীর ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত ছিলো। হিউয়েন সাং এর বিবরণ হতে জানা যায়, নগরীর বিস্তৃতি ছিল ২০লি (প্রায় ৩$\frac{১}{২}$ মাইল)। তিনি সেখানকার এক বিশাল বিহারে প্রায় একশত বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখেন। তিনি আরও দেখতে পান বিহারটির অনতি দূরে সম্রাট অশোক নির্মিত দুইটা স্তুপও ছিল। সাগল নগরীর সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রথমে মতপার্থক্য থাকলেও বর্তমানে পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্ট কেও সাগল নগরী বলে বিবেচনা করা হয়। তবে, কানিংহামের বিবরণ অন্য কথা বলে। কানিংহাম মহাশয় ঝং জেলার 'সনগ্লয়ন টিবা' (সনগর পর্বত) কে প্রাচীন মদ্র রাজ্যের রাজধানী সাগল নগর রূপে সনাক্ত করেন।[১৭] রাজা মিলিন্দের জন্মস্থান যেহেতু অলসন্দা দ্বীপের কলসী নামক গ্রামে অর্থাৎ বর্তমানে তা মধ্য পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টকে নির্দেশ করে, তাই 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থটির রচনাস্থল এর মধ্যে অথবা পাশ্ববর্তী স্থানে হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। ঐতিহাসিকদের তত্ত্ব-উপাত্ত হতে জানা যায় যে, এই অলসন্দা ভারত বর্ষের সিন্দু নদীর দ্বীপস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া রূপে অধিক সমর্থিত হয়। রাজা মিলিন্দের জন্মভূমি কলসী গ্রামকে মূলত মনে করা হয় Karsi। আর মূল যে গ্রন্থ রয়েছে তা থেকে পাওয়া যায় বেশ কয়েকজন অমাত্যের নাম। পণ্ডিতদের মতে, তাদের মধ্যে দেব মন্তিয় ও অনন্তকায় যথাক্রমে Demetrious এবং Antiocho। গ্রীকদের নগরী Euthumedia যেই নগরী ঠিক অভিন্ন নগরী হল সাগল। পশ্চিম ভারতের ককেশাস পর্বতের মধ্যে অবস্থিত এই ইউথুমিডিয়া নগরী, এর বর্তমান নাম হলো চারিকা গ্রাম। যা কাবুল ও পম্‌জসের নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। আমরা জেনেছি যে, মিলিন্দ নরপতি খ্রিঃ পূঃ ১৪০ হতে ১১০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। রাজত্বকালে তিনি কোন এক সময় অথবা মধ্যভাগে আচার্য নাগসেনের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে মিলিত হন এবং তাঁর বিভিন্ন সুদোত্তর পান পণ্ডিত নাগসেনের নিকট হতে। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে, অনেক পণ্ডিত ধারণা করেন আয়ুষ্মান নাগসেন এই মহামূল্যবান 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তাই নাগসেনের জন্ম-বৃত্তান্ত থেকে তাঁর জন্মস্থান নিরূপণ করলে আমরা মিলিন্দ প্রশ্নের রচনাস্থল সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে পারি। আয়ুষ্মান নাগসেনের এক অনুত্তর নামক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন গঙ্গাতীরস্থ 'কজঙ্গল' নামক গ্রামে। পালি সাহিত্য 'কজঙ্গল' নামক গ্রামটির কথা বহু গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। 'কজঙ্গল' নামক স্থানটির ভৌগোলিক সীমারেখা পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়, এটি পূর্ব ভারতে অবস্থিত ছিল। পূর্ব-ভারতে রাজমহলের প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে কঙ্কজোলে অবস্থিত। 'কজঙ্গল' বিনয়পিটক অনুসারে মধ্য প্রদেশেরই পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের এক প্রসিদ্ধ নিগম (পুরত্‌লিমায় দিসায় কজঙ্গলং নাম নিগমো)।[১৮] খ্রিঃ সপ্তম শতকের চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর পরিভ্রমণ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তিনি সপ্তম শতকে কজঙ্গল

পরিভ্রমণ করেন। যা তাঁর কাছে ক-ছু-য়েন-কি-লো নামে পরিচিত ছিল।[১৯] এর বিস্তৃতি ছিল তখন ২০০০ লি বা প্রায় ৩৩০ মাইল। জনপদের রাজধানী ছিল চম্পানগর। চম্পানগর থেকে পূর্ব দিকে কজঙ্গলের দূরত্ব ছিল মাত্র ৪০০ লি বা প্রায় ৬৭ মাইল। হিউয়েন সাং যখন কজঙ্গলে পরিভ্রমণ করেন তিনি সেখানে জনবসতি লক্ষ্য করেন এবং তিনি সেখানকার অন্তত সাতটি বৌদ্ধ বিহারে বহুসংখ্যক ভিক্ষু দেখেন। পরিব্রাজক এই নিগমে দশটি দেবমন্দির লক্ষ্য করেন। কজঙ্গলের বিস্তৃতি ছিল গঙ্গার উত্তর-পূর্ব হতে সুবর্ণরেখার দক্ষিণ-পুর্ব পর্যন্ত। কানিংহাম মহাশয় বর্তমানে পূর্ব ভারতের রাজমহলের প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'কঙ্কজোল' নামক স্থানকে কজঙ্গল রূপে সনাক্ত করেছেন।[২০] যদি 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থখানি নাগসেন অথবা মিলিন্দ রাজ্যের কোন রাজকর্মচারী রচনা করে থাকেন, তবে আমরা বলতে পারি যে, উক্ত গ্রন্থটি রচিত হয় পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে অথবা এর আশে-পাশের কোন অঞ্চলে।

তথ্য নির্দেশ :

১. Milinda's Question.Vol-1. Translator's Introduction. P.xxi (Sacred Books of Buddhists. vol. 33, London 1963.

২. The Milinda Questions : Mrs. Rhys Davids; London, 1930 P.ii

৩. A.I. Basham : The Wonder that was India, London, 1954, PP. 227, 274

৪. মিলিন্দপ্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ) : পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৭৭, পৃ. xxxii

৫. মিলিন্দপ্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ) : পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির: প্রাগুক্ত পৃ.৪১-৪২

৬. প্রাগুক্ত; পৃ. xi

৭. The Milinda Question : Mrs. Rhys Davids; London, 1930 P.ii

৮. The Milindapanha : V. Trenckner; P.T.S London, 1962, PP 25-89

৯. The Milindapanha : Ibid PP 99-328

১০. Ibid PP 329-419

১১. Ibid, PP -24,419,420

১২. History of Indian Literature, (HIL) : Winternitz; Vol. ii PP. 174-183

১৩. মিলিন্দপ্রশ্ন : প্রাগুক্ত; পৃ. xxii

১৪. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৮৮, পৃ. ১১৭

১৫. জাতক, Pali Text Society iv. P.230; v. Page 283; vi, pp 47m 473

১৬. Buddhist Records of the western World: S. Beal; london, 1884 (Reprinted; Delhi, 1981). I. PP. 165-5

১৭. Ancient Geography of India, by A. Currin-Gham, London, 1871, Enlarged edition, Varanasi, 1975, PP. xxix, 153

১৮. Virayapitaka : P.T.S London. I.P. 197; ii. P.38

১৯. On yuas Chwang's Travels in India, ed. Tomas Watters, London, Royal Asiatic Society, 1908, (ii), PP. 180-83

২০. Ancient Geography of India : A. Curringham; London 1871, Enlarged edition, varansi, 1975, PP. 403

দ্বিতীয় অধ্যায়

আয়ুষ্মান নাগসেন এবং রাজা মিলিন্দের জীবন কাহিনী

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের জীবন-কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্যের লৌকিক সত্যতার সাথে সাথে ঐতিহাসিক বহু তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং বিচার বিশ্লেষণ করে যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে তা এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। যথা:

- নাগসেন ও মিলিন্দের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত;
- রাজা মিলিন্দের পরিচয়;
- মিলিন্দের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা;
- নাগসেনের জন্ম;
- নাগসেনের প্রব্রজ্যা;
- নাগসেনের অপরাধ ও দণ্ডকর্ম;
- নাগসেনের পাটলিপুত্রে গমন ও অর্হত্ব লাভ;
- আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের সাক্ষাৎকার।

নাগসেন ও মিলিন্দের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের পূর্ব জীবন বৃত্তান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত হতে জানা যায়, কাশ্যপ বুদ্ধের সময়কালে গঙ্গানদীর তীরবর্তী এলাকায় একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুবিহার ছিল। তাতে বহুসংখ্যক ভিক্ষু শ্রমণ ধর্ম-কর্ম পালনসহ একত্রে বসবাস করতো। বিহারের যাবতীয় কাজ একজন ভিক্ষু ও এক শ্রমণের উপর অর্পিত ছিল। একদিন বিহারের এক ভিক্ষু বিহার পরিষ্কার করার পর তার আবর্জনা ও ময়লাসমূহ অন্যত্র ফেলে আসার জন্য এক শ্রমণকে আদেশ করলেন। শ্রমণ ছিল অন্য মনস্ক। তাই সে ভিক্ষুর আদেশ ঠিকমতো শুনতে পায়নি। তৃতীয়বারে ভিক্ষু ক্রুদ্ধ হয়ে যান এবং ঝাড়ু দিয়ে শ্রমণকে আঘাত করেন। আঘাতের ফলে শ্রমণ সেইকাজ করতে বাধ্য হন। শ্রমণ ভিক্ষুর আদেশ অনুসারে আবর্জনাগুলো নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন। নিক্ষেপকালে শ্রমণ প্রার্থনা করেন-

"ততো সো রোদন্তো ভরেন করবরং ছডডেন্তো ইমিনাহং কচবর ছড্ডনপুলঞ কম্মেন যাবাহং নিব্বানং পাপুনামি এথুন্তবে নিব্বত্ত নিব্বত্তটঠান মজ্ঝন্তিক সুরিযো বিয মহেসক্খো মহাতেজো ভবেয্যংতি পঠন পত্থনং পট্ঠপেসি।" অর্থাৎ- নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত জন্ম জন্মান্তরে বিহার পরিষ্কার করার পুণ্যে ফলে যেন আমি মহা প্রজ্ঞাবান হয়ে জন্মগ্রহণ করি, আমার প্রতিভা যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়। এবং জগতে যেন কোন যুক্তিতর্ক আমাকে

পরাস্ত করতে না পারে।[১] ভিক্ষু শ্রমণকে বিহারে ফিরে আসতে দেরি দেখে গঙ্গাতীরে যান। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি শ্রমণকে ঐ রকম প্রার্থনা করতে শুনে ফেলেন। শ্রমণের কথা শুনার ফলে সাথে সাথে বৌদ্ধ ভিক্ষু এই প্রার্থনা করেন যে, "আমার আদেশে এই শ্রমণ আবর্জনা পরিষ্কার করেছেন। আমি যেন আমার এই পুণ্যের ফলে জন্মজন্মান্তরে মহাপ্রজ্ঞাবান হয়ে জন্মগ্রহণ করি ও শ্রমনের সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হই এবং বুদ্ধ শাসনে দীপ্তিমান হয়ে বিরাজ করতে পারি।"

এভাবে ভিক্ষু ও শ্রমণ স্বীয়পুণ্য গুণে জন্ম-জন্মান্তরে দেব ব্রহ্মলোকে মহাসুখ ভোগ করেন। মহামানব গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৫০০ শত বছর পর একজন ত্রয়তিংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন এবং অপরজন মিলিন্দ নামক মহাপ্রজ্ঞাবান রাজা হয়ে সাগল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থ অনুসারে জানা যায়, রাজা মিলিন্দ ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান। তিনি একাধারে পণ্ডিত, বিচক্ষণ ও ধীশক্তি সম্পন্ন মহাক্ষমতাশালী অধীশ্বর ছিলেন। তিনি ছিলেন বহু শাস্ত্রবিদ, অতীত অনাগত ও বর্তমান কার্যসমূহ অতি বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্নকারী। তাঁর সময়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপে তাঁর সমকক্ষ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ নৃপতি ছিল না। তিনি তর্কযুদ্ধে এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে কোন শ্রমণ, ভিক্ষু, যোগী, সন্ন্যাসী তাঁর সাথে তর্ক করতে সাহস পেত না।

সমকালীন সময়ে হিমালয় পাদদেশের রক্ষীততল নামে এক আশ্রম ছিল। সেখানে এক বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ বাস করতো। ভিক্ষুসংঘের প্রধান ভিক্ষু ছিলেন অশ্বগুপ্ত স্থবির। তিনি ছিলেন শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রবীণ ভিক্ষু। একদিন তিনি ঋদ্ধিবলে জানতে পারেন যে, মহারাজ মিলিন্দকে তর্কে পরাস্ত করতে পারে জগতে এমন কোন ভিক্ষু বর্তমান নেই। তারপরও তিনি তাঁর সন্দেহ দূর করার জন্য ভিক্ষুসংঘের আহ্বান করেন। ভিক্ষু সংঘের নিকট তিনি জানতে চান, রাজা মিলিন্দের সাথে তর্ক করে তাকে পরাস্ত করতে পারে এমন কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু আছে কিনা। তিনি একথা তিন বার জিজ্ঞাসা করার পরও ভিক্ষুসংঘ নীরব থাকেন। এরূপ অবস্থা দেখে অশ্বগুপ্ত বলেন, ত্রয়তিংশ স্বর্গের বিজয়ন্ত প্রাসাদের পূর্বে কেতুমতী নামক সুরম্য অট্টালিকার অধীশ্বর দেবপুত্র মহাসেনই মিলিন্দের গুরু ছিলেন। একমাত্র তিনিই আছেন সমগ্র স্বর্গ-মর্তে যে রাজা মিলিন্দকে পরাস্ত করতে পারেন। একথা শুনার পর স্থবির অশ্বগুপ্ত অভিজ্ঞ ভিক্ষুমন্ডলীসহ ত্রয়তিংশ দেবলোকে উপস্থিত হন। ত্রয়তিংশ স্বর্গের অধিপতি ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্র ভিক্ষুমন্ডলীকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। দেবরাজ শক্রর কাছে অশ্বগুপ্ত তাঁদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই বিষয়ে দেবপুত্র মহাসেনকে জ্ঞাপন করেন। দেবপুত্র ভাবলেন মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করা বড়ই কষ্টদায়ক। তাই তিনি প্রথমে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে সম্মতি প্রদানে বিরত থাকেন। কিন্তু পরবর্তীতে বুদ্ধ শাসনের কল্যাণ সাধন হবে বলে তাঁদের এই প্রস্তাবে রাজী হন। মহাসেন দেবপুত্রের সম্মতি লাভ করে ভিক্ষু সংঘ আবার হিমালয় ত্যাগ করে সাগল নগরীতে ঘোরাফিরা করতে লাগলেন। পরবর্তীতে অনুত্তর নামক এক ব্রাহ্মণ পরিবারে নাগসেন জন্মগ্রহণ করেন। যা গঙ্গাতীরস্থ 'কজঙ্গল' গ্রাম নামে পরিচিত ছিল।

রাজা মিলিন্দ ও নাগসেনের পূর্বজন্ম সম্পর্কে চীনা ভাষায় 'নাগসেন ভিক্ষু সূত্রের' পূর্বযোগে পাওয়া যায় অন্য তথ্য। এতে বলা হয়েছে- এক সময় ভগবান বুদ্ধ 'সিয়-ওএ-কোক্' (শ্রাবন্তীতে) বাস করতেন। এ সময় শ্রাবন্তীতে বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা দ্বারা জনসমাকুল থাকায় তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। তিনি একাকী নিভৃত বাসের জন্য "পারলোচোঙ্গশু" (পারিলেষ্য) নামক অরণ্যে গিয়ে এক বটবৃক্ষের নিচে ধ্যানমগ্ন হয়ে উপবেশন করেন। অন্য এক অরণ্যে সেই সময় এক হস্তীরাজ পাঁচশত অনুচরের সাথে বাস করতেন। হস্তীরাজও জনকোলাহলে বিরক্ত হয়ে পরেন। হস্তীরাজ অনুচরদের ত্যাগ করে ভগবান বুদ্ধের নিকট এসে বাস করতে থাকেন। তথাগত হস্তীরাজকে খুবই স্নেহ করতেন। ভগবানের সেবায় হস্তীরাজ বহুদিন নিয়োজিত থাকেন।

বুদ্ধ সেই স্থান ত্যাগ করলে বুদ্ধের অনুপস্থিতি হস্তীরাজের মনে প্রবল বিচ্ছেদ যন্ত্রণা দেয়। যতদিন সে জীবিত ছিল ততদিন বুদ্ধের স্মৃতি স্মরণ করে। এই পুণ্যফলে হস্তীরাজ পরজন্মে মনুষ্যরূপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। বয়:প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি বৈরাগ্য সাধনায় নিয়োজিত হন। তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে কোন এক পর্বতে সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন করেন। সেই একই পাহাড়ে আরও একজন সন্ন্যাসী থাকতেন। তাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। তাঁদের একজন অপর জনকে বলেন, "ভাই! সংসার বড়ই দোষের আকর, এটা নানা দুঃখে পরিপূর্ণ। এই কারণে নির্বাণ শান্তির আশায় আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করে ব্রহ্মচর্য পালন করছি।" অপরজন বলেন, আমি এই কারণে সন্ন্যাস জীবন যাপন করতেছি যে, যাতে এই পুণ্যফলে ভাবী জীবনে লোক বিজয়ী সম্রাট হতে পারি।"

পরজন্মে তাঁদের মধ্যে একজন সমুদ্রের পরবর্তী বী-নন (মিলিন্দ) নামে রাজকুমার হলেন। অন্যজন পি-কিন-কুন (হিমালয়) প্রদেশের কজঙ্গল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের সময় সে স্থানে এক হস্তী শাবকের জন্ম হয়। সাধারণভাবে হাতীকে সেখানে নাগ বলা হতো। এই সংযোগের মিল রেখে তার নাম 'নাগসেন' রাখা হয়। পূর্বজন্মে তিনি নির্বাণ লাভের আশা করেছিলেন বলে তিনি পরজন্মে বাল্যকাল হতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

নাগসেনের মাতুলের নাম ছিল লোহন বা রোহন। যিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই নাগসেন মাতুলের সাথে থেকে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হতেই নাগসেন ছিলেন বেশ প্রতিভাবান। তিনি তাঁর সমস্ত শিক্ষা দ্রুত শেষ করে ফেলেন। বিশ বছর বয়সে তাঁর 'হো-সেন বিহারে' উপসম্পদা হয়। ভিক্ষু নাগসেন নির্বাণ লাভের আশায় ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন এবং ঘটনাক্রমে রাজা মিলিন্দের সাথে দেখা হয়।

রাজা মিলিন্দের পরিচয়

ঊনবিংশ শাস্ত্রে পারদর্শী রাজা মিলিন্দ খ্রি:পূ: দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে জম্বুদ্বীপের সাগল নগরে অলসন্দা দ্বীপে কলসী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশকে সাগল নগর বলে ধরা হয়। আর অলসন্দা কাবুলের অনতিদূরে আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত ছিল।[২] 'মিলিন্দপঞ্চহো' গ্রন্থে আফগানিস্তানে কাবুলের অনতিদূরে সম্ভবত আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত অলসন্দা প্রাচীন যোন সাম্রাজ্যের এক প্রসিদ্ধ নগরী বলে উল্লেখ করা হয়।[৩] গাইগার মহাশয় একে কাবুলের সন্নিকটে মহান গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরী বলে মনে

করেন।[৪] ধারণা করা হয় গ্রীক রাজাদের সময় (প্রায় খ্রি:পূ: ৩য় শতক- খ্রি: ১ম শতক) কাবুল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভারতবর্ষের অধীন ছিল।

'অপদান' গ্রন্থে অলসন্দা উপজাতির এক তালিকায় বর্ণিত হয়েছে যে, এই গ্রন্থ রচনাকালে (প্রায় খ্রি: পূ: ২য় শতক কিংবা তার পরবর্তী সময়ে) অলসন্দার অধিবাসীরা অলসন্দা নামে পরিচিত ছিল।[৫] পরবর্তীতে তাদের আবাসস্থলে প্রতিষ্ঠিত নগরটি অলসন্দা নামে পরিচিতি লাভ করে। 'মিলিন্দপঞ্চহো' গ্রন্থের অভ্যন্তরে এক জায়গায় চীন, বারাণসী, গান্ধার প্রভৃতি স্থানের সাথে অলসন্দার পুন: উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬]

রাজা মিলিন্দ শৌর্য-বীর্যে পরাক্রমশালী এবং তর্কশাস্ত্রে ছিলেন মহাপণ্ডিত। সমগ্র জম্বুদ্বীপে তাঁর সমতুল্য কেউ ছিল না। তর্কযুদ্ধে ছিলেন তিনি অপরাজেয়। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, ন্যায়পরায়ণ, চতুর, মেধাবী, বড় পণ্ডিত, ভূত-ভবিষ্যত, বর্তমান মন্ত্র ও যোগ বিধান ক্রিয়ার আচরণ করার পরীক্ষা করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তিনি বহু তীর্থংকর, শ্রমণ-ব্রাহ্মনদের সাথে তর্কে লিপ্ত হতেন। কিন্তু কেউ তাঁকে পরাস্ত করে সন্তুষ্ট করতে পারতেন না। তাঁর সন্দেহ দূরীভূত এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না। তিনি ছিলেন ঊনবিংশত গুণে গুণান্বিত। যথা- (১) শ্রুতি (২) স্মৃতি (৩) সাংখ্য (৪) যোগ (৫) ন্যায় (৬) বৈশেষিক (৭) গণিত (৮) সঙ্গীত (৯) চিকিৎসা (১০) চতুর্বেদ (মতান্তরে ধনুবিদ্যা) (১১) পুরাণ (১২) ইতিহাস (১৩) জ্যোতিষ (১৪) যাদুবিদ্যা (১৫) হেতু বা তর্ক (১৬) মন্ত্রণা (১৭) যুদ্ধবিদ্যা (১৮) ছন্দ এবং (১৯) সামুদ্রিক। তিনি ধনাঢ্য, মহাধনী এবং বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সৈন্য সামন্ত ছিল অসংখ্য।[৭] একদিন তিনি আপন মনে বলে উঠলেন, "অহো! জম্বুদ্বীপ শূন্য, অহো! জম্বুদ্বীপের খ্যাতি প্রলাপমাত্র! আমার সাথে আলাপ করতে পারেন। আমার সন্দেহ দূর করতে পারেন, এমন শ্রমণ ব্রাহ্মণ কি কেউ নাই?" কেননা গৃহী ভিক্ষু সংঘের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি তাঁর সন্দেহ দূর করতে পারতেন। তাই তাঁর এমন খোদ্যোক্তি ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কত বড় দার্শনিক ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। পরবর্তীতে মহাসেন দেবপুত্র তাবতিংস স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে ভদন্ত নাগসেন হয়ে মিলিন্দ রাজের সকল প্রশ্নের উত্তর ও সন্দেহ দূর করেন। রাজা মিলিন্দ ছিলেন ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও নরপতি। এই বিখ্যাত রাজার নাম প্রাচীন বহু লেখকগণ যেমন স্ট্রাবো, প্লুটার্ক, ট্রেগার্স, জাস্টিন প্রভৃতি লেখক তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ জনশ্রুতিতেও এই মিলিন্দ রাজার নামটি পাওয়া যায়। তবে তাঁর পিতা-মাতাও প্রথম জীবন সম্পর্কে সে রকম কোন সঠিক তথ্য ও প্রামাণিক দলিল পাওয়া যায় না। স্ট্রাবো ও প্লরিয়াসের লেখায় তাঁর সম্পর্কে কিছু ধারণা সুস্পষ্ট হয়। পশ্চিম ভারতে ও সিন্ধু দেশে ডিমিট্রিয়াসের সৈন্য পরিচালনার ভার ছিল অ্যাপোলাডোটাসের উপর। একইসাথে পূর্ব ভারতে সৈন্য পরিচালনার ভার ছিল মিলিন্দের উপর। তাই এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, তিনি যৌবনকালে সৈন্য পরিচালনা ও যুদ্ধ পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন। সম্রাট ডিমিট্রিয়াস মিলিন্দের সৈন্য পরিচালনার নৈপুন্য দেখে মুগ্ধ হন। তিনি এতটাই মিলিন্দকে পছন্দ করেন যে, তাঁর প্রিয় কন্যা আপাথোক্লিয়াকে মিলিন্দের সাথে বিবাহ দিয়ে জামাতা করেন। এই ঘটনার পরবর্তীতে মিলিন্দের শক্তি আরও

দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ধারণা করা হয়, আনুমানিক খ্রি:পূ: ১৬৫ অব্দে ডিমিট্রিয়াসের মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে ভারতের রাজত্বভার মিলিন্দের হাতে অর্পণ করা হয়। অনেক পণ্ডিত ধারণা করেন, সেই সময় হয়তো অ্যাপোলোডোটাসের সাথেও তাঁর সংঘর্ষ হয়ে থাকবে। তিনি দক্ষিণে রাজপুতানা ও পূর্বে অযোধ্যার ভিতর বেশ কিছু অংশ আধিপত্য বিস্তার লাভ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল অন্তত ত্রিশ বছরেরও অধিক। তিনি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইতিহাসের নানান জায়গায় নানানভাবে তাঁর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সবকিছুই অস্পষ্ট ও ঘোলাটে। 'প্লেরিয়ার্স' এর লেখক উল্লেখ করেছেন যে, বারিগাজাতে (বর্তমান ব্রোচ-এ) প্রাচীন গ্রিক মুদ্রা 'দ্রাক্মী'র প্রচলন আছে। এই সকল মুদ্রাতে আলেকজান্ডার, ডিমিট্রিয়াস, অ্যাপোলোডাটাস ও মিনান্দারের ছাপ অঙ্কিত আছে।

রাজা মিলিন্দ সম্পর্কে যেসব প্রামাণিক দলিল পাওয়া গেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো তাঁর প্রচলিত মুদ্রা। এখন পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকালের বত্রিশটি মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। অধিকাংশই হচ্ছে রজত ও তাম্র নির্মিত। সেগুলোর মধ্যে আটটি মুদ্রায় রাজার চিত্র রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই উত্তর ভারতের পশ্চিমে কাবুল হতে পূর্বে মথুরা ও উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগের মধ্যেই পাওয়া যায়। এসবের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, রাজা মিলিন্দের রাজ্যসীমা ছিল বেশ বিস্তৃত ও প্রসারিত V. Smith এর Early History of India গ্রন্থে মিলিন্দের একটি মুদ্রা প্রদর্শিত হয়েছে। এর একদিকে তাঁর গ্রীবা পর্যন্ত মূর্তি অঙ্কিত আছে। এই মুদ্রার উপর রাজার প্রতিকৃতি অতি চমৎকার, আয়ত নাসিকা, সুন্দর চেহারা ও ছবি।

যা দেখে মনে হয় জীবন্ত ও সজীব।[৮] কোন কোন মুদ্রায় যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে তা তরুণ বয়সের প্রতিকৃতি। আবার কিছু কিছুতে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থার প্রতিকৃতি। এতে বুঝা যায় রাজা মিলিন্দের রাজত্বকাল বেশ দীর্ঘ ছিল। মুদ্রাগুলোতে দুটি ভাষা পরিলক্ষিত হয়। মুদ্রার এক পৃষ্ঠে গ্রীক ভাষায় এবং অপর পৃষ্ঠে তদানীন্তন পালি ভাষায় লেখা আছে। আবার তাঁর কোন কোন মুদ্রায় ধাবমান অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, শূকর, চক্র অথবা তালপত্র উৎকীর্ণ বা ক্ষোদিত আছে। 'চক্র' মহামান গৌতম বুদ্ধের ধর্ম দেশনার মূল চিহ্ন ছিল। তাই বুঝা যায় যে, রাজা মিলিন্দের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল। সম্রাট অশোকের নির্মিত প্রস্তর স্তম্ভেও এরকম চিহ্ন দেখা যায়। তাই এই দ্বারা প্রমাণিত যে, মিলিন্দ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একটি মুদ্রা আবিস্কৃত হয় তাঁর রাজত্বকালের। এতে অঙ্কিত আছে:

এক পৃষ্ঠে- বসিলেওস ডিকাইওস মেনান্দ্রো

অপরর পৃষ্ঠে– মহরজস ধর্মিকস মেনন্দ্রস।

এখানে 'ধর্মিকস' শব্দের অর্থ 'ধার্মিকস্য'। এই মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাজা মিলিন্দ অবশ্যই স্বধর্ম ত্যাগ করেছিলেন এবং বিবেকের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেন।

পালি 'মিলিন্দ প্রশ্ন' এর নিগমনে উল্লেখ আছে যে, রাজা মিলিন্দ ভদন্ত নাগসেনের আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হন। নাগসেনের বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি ঘোষণা দেন-

"উপাসকং মং ভন্তে নাগসেন ধারেথ অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতন্তি"

অর্থাৎ 'প্রভু নাগসেন, আজ হতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।" মিলিন্দপ্রশ্নের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে- নাগসেনের প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁকে শত সহস্র মূল্যের কম্বল দ্বারা পূজা করেছেন এবং উপরন্তু প্রতিদিন আটশত বৌদ্ধ ভিক্ষুর জন্য ভোজনের খাদ্য পাঠাতেন। শুধু এই নয়, তারপর রাজা 'মিলিন্দ বিহার' নামে একটি সংঘারাম নির্মাণ করে দেন। তাতে তাঁর পাত্র-মিত্রসহ একত্রে স্থবির নাগসেন প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে সমর্পণ করেন। বহু সংখ্যক ভিক্ষুসহ নাগসেনকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা এই চতুর্বিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে সেবা পরিচর্যা করতেন। তিনি তাঁর বাকি জীবন বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ও ধর্ম আচার অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। পরবর্তীতে তিনি বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

পালি 'মিলিন্দ প্রশ্ন' এর নিগমনে আরও দেখা যায় তিনি পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে সন্ন্যাস জীবন ধারণ করেন। সন্ন্যাস জীবনে তিনি অর্হৎ লাভ করেন। অর্হৎ লাভের কারণে মৃত্যুর পর তাঁর দেহাবশেষ নেওয়ার জন্য প্রজাদের মনে চাঞ্চল্য ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। প্রজারা রাজ্যে তাঁর ভস্মাবশেষের উপর বড় বড় স্তূপ নির্মাণ করেন। বৌদ্ধধর্ম সাহিত্য থেকে জানা যায়, বৌদ্ধ ইতিহাসে দেহাবশেষের উপর স্তুপ নির্মাণ বৌদ্ধদের প্রচলিত প্রথা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাজা মিলিন্দ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

মিলিন্দের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

সমগ্র জম্বুদ্বীপে মহারাজ মিলিন্দ ছিল তর্ক যুদ্ধে অদ্বিতীয় ও মহাপ্রজ্ঞাবান। তিনি যখনই কোন বিজ্ঞ, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী দেখতেন তাদের সাথে বিভিন্ন তর্কে লিপ্ত হতেন। কিন্তু কেউ তাঁর প্রশ্নের সদোত্তর দিতে পারতেন না। তাই তিনি সব সময় অতৃপ্তই থেকে যেতেন। তিনি প্রায় নগর ভ্রমণে যেতেন। একদিন রথে চড়ে সেনার দর্শনের উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে গিয়ে দেখতে পান সেনা গণনা করে বাদপ্রিয়, লোকায়ত ও বিতন্ডাবাদীদের সাথে তর্কেচ্ছায় আলাপে নিমগ্ন। ঔৎসুক্যচিত্ত, নির্ভীক ও বিজম্ভকারী রাজা মিলিন্দ উপর দিকে সূর্য অবলোকন করলেন এবং নিজের অমাত্যকে আহ্বান করলেন– "এখনও অনেক সময় বাকি আছে, এত সত্বর নগরে প্রবেশ করার কি প্রয়োজন? এখানে কোন পণ্ডিত, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সংঘ নেতা, গণনেতা, গণাচার্য আছেন কি যিনি অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ সম্বন্ধে জানেন, যিনি আমার সাথে আলাপ ও আমার সন্দেহ নিরসন করতে পারেন, যাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সংশয় বিনোদন করতে পারি?"

রাজার বাসনার কথা শুনে পঞ্চশত যবন রাজা মিলিন্দকে বললেন- "হ্যাঁ, মহারাজ! ছয়জন ধর্মগুরু আছেনঃ

(১) পূরণ কাশ্যপ,

(২) মক্খলি গোশাল,

(৩) নিগণ্ঠ নাতপুত্র,

(৪) সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্র,

(৫) অজিত কেশকম্বলী ও

(৬) ককুধ কচ্চায়ন।

তাঁরা সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, প্রাজ্ঞ, যশস্বী ও তীর্থঙ্কর এবং বহুজনের দ্বারা সম্মানিত ছিল সেই সময়। পঞ্চশত যবন মিলিন্দরাজকে তাদের নিকট গমন করতে বলেন এবং যা কিছু জানার আছে তাদের কাছে সকল প্রশ্নের উত্তর পাবেন।[৯]

রাজা মিলিন্দ সর্বপ্রথম পূরণ কাশ্যপের নিকট সাক্ষাৎ ও তাঁর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যান। পূরণ কাশ্যপ উপরোক্ত ছয়জন শাস্তার ভিতর সবচেয়ে বয়স্ক আচার্য ছিলেন। পূরণ কাশ্যপ সম্পর্কে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে বহু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি যে মতবাদ প্রচার করতেন তাঁর সারমর্ম হলো আত্মা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ আত্মা সুকর্ম বা দুষ্কর্ম কোন কর্মেরই ফল ভোগ করে না। তাঁর মতে দেহই কাজ করে। দান, ধ্যান, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সৎকর্মেও যেমন পুন্যার্জন হয় না তেমনি প্রাণী হত্যা, চুরি করা, মিথ্যা ভাষণ দেওয়া ইত্যাদি অসৎ কর্মেও মানুষের কোন রূপ পাপ হয় না। মানুষ ভালমন্দ যে কাজই করুক না কেন আত্মা এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয় না। দেহই ভোগ করে কর্মের ফল।[১০]

রাজা মিলিন্দ পূরণ কাশ্যপের আশ্রমে গিয়ে পূরণ কাশ্যপের সাথে সম্ভাষণ বিনিময় করে এক প্রান্তে বসলেন। বসার পর মিলিন্দ রাজা কাশ্যপকে তাঁর প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "ভন্তে কাশ্যপ! কে এই সংসার পালন করছে।"

কাশ্যপ উত্তর দিলেন "মহারাজ! পৃথিবী সংসার পালন করছে।" এরপর মিলিন্দরাজ বললেন, যদি পৃথিবী সংসার পালন করে, তবে অবীচি নরকগামী প্রাণীগণ পৃথিবী অতিক্রম করে কেন গমন করে?"

রাজার এমন প্রশ্নে পূরণ কাশ্যপ তা গ্রহণ করতেও পারেন না, আবার তা গ্রাহ্যও করতেও পারেন না। তিনি নতগ্রীব, অধোমুখ, হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকলেন। মিলিন্দ তাঁর প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে মক্খলি গোশালের নিকট গমন করেন। মক্খলি গোসাল ছিলেন নগ্ন সন্ন্যাসী। তাঁর অনেক অনুসারী ছিলেন। তাঁর মতবাদ ছিল সকল জীবই পুনরায় জীবন গ্রহণ করতে সক্ষম। জগতের সবকিছু নিয়তির দ্বারা পরিচালিত হয়। তিনি 'নিয়তি সঙ্গতি ভাব' এ মতটি প্রচার করতেন। তিনি প্রচার করতেন নিয়তি জীবকে পরিচালিত করে, জীবের নিজস্ব কোন বল বা সামর্থ্য নাই। সুতরাং তিনি কর্মফল বিশ্বাস করতেন না। আবার তিনি সংসার শুদ্ধির মত প্রচার করতেন। তাঁর মতে মোক্ষলাভের জন্য জীবের বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। সত্তার বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং প্রত্যেক সত্ত্বাই অনন্ত।[১১]

রাজা মিলিন্দ মক্খলি গোশালের কাছে গিয়ে তাঁর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মিলিন্দ প্রশ্নের আলোকে তাঁদের কথোপকথন তুলে ধরা হলো: "ভন্তে গোশাল! ভাল ও মন্দ কর্ম আছে কি? পুণ্য ও পাপ, সকৃত ও দুস্কৃত কর্মের ফল বিপাক আছে কি?"

"না মহারাজ! ভাল ও মন্দ কোন কর্ম নাই, পাপ ও পুণ্য কর্মের কোন ফল নাই। মহারাজ! ইহলোকে যারা ক্ষত্রিয়, তাঁরা পরলোকে গিয়ে পুনরায় ক্ষত্রিয়ই হবেন। যাঁরা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল বা পুক্কুস জাতি হবেন তাঁরা পরলোকে গিয়ে পুনরায় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল বা পুক্কুস জাতি হবেন। পাপ ও পুণ্য কর্মের কি প্রয়োজন?"

রাজা মিলিন্দ বললেন, "ভন্তে গোশাল! যদি ইহলোকে যিনি ক্ষত্রিয় তিনি পরলোকে গিয়েও যদি ক্ষত্রিয়ই হয়ে থাকেন এবং পাপ ও পুণ্য কর্মের কোন করণীয় না থাকে, তাহলে যারা ইহজগতে হস্তচ্ছিন্ন তারা পরলোকে গিয়েও পুনরায় হস্তচ্ছিন্ন হবে, যারা এই জগতে পাদচ্ছিন্ন তারা পাদচ্ছিন্ন হবে, যারা হস্তপাদচ্ছিন্ন তারা হস্তপাদচ্ছিন্ন হবে, যারা কর্ণ ও নাসিকাচ্ছিন্ন তারা কর্ণ ও নাসিকাচ্ছিন্ন হবে কি? রাজার এই কথা শুনে গোসাল কোন উত্তর দিতে পারেন নি। এভাবে মিলিন্দরাজ যাকে যেখানে পেতেন, তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারতো না। রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁর রাজ্যে এমন কোন শ্রমণ-ভিক্ষু আছেন কি না, যিনি তাঁর সকল সন্দেহ দূর করতে পারেন। কিন্তু তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই সকল শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, গৃহী তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হতেন। কেউই রাজার মন-রক্ষা করতে পারতো না। অসংখ্য প্রশ্ন তাঁর মনে ঘুরপাক খেতো। কিন্তু রাজ্যে এমন কোন শ্রমণ-ভিক্ষু পাওয়া গেলো না, যিনি রাজা মিলিন্দের সন্দেহ দূর করে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন। তাই রাজা মিলিন্দের মন অতৃপ্তই থেকে যেত।

নাগসেনের জন্ম

সাগল নগরে এমন কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ছিল না, যিনি মিলিন্দ রাজকে সন্তুষ্ট করতে পারতেন। সকলেই একে একে মিলিন্দ রাজের কাছে তর্ক যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে অন্যস্থানে চলে যেতেন। যারা অন্যত্র যেতেন না, তারা সকলে নীরব থাকতেন। তৎকালীন সময়ে হিমালয় পর্বতের রক্ষিততলে বহু অর্হৎপ্রাপ্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন, 'মিলিন্দ প্রশ্ন' অনুসারে এর সংখ্যা ছিল প্রায় কোটিশত। সেখানকার সবচেয়ে প্রজ্ঞা সম্পন্ন বৃদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত। একদিন আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত দিব্য কর্ণে রাজা মিলিন্দের খোদ্যোক্তি শুনতে পান। তিনি ভিক্ষু সংঘকে যুগন্ধর পর্বত শিখরে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। ভিক্ষুসংঘ সমবেত হলে তিনি পর পর তিনবার সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন এমন কেউ বৌদ্ধ ভিক্ষু সেখানে আছেন কি না, যিনি মিলিন্দরাজের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। কিন্তু সভায় এমন কেউ পাওয়া গেল না যিনি মিলিন্দরাজের সাথে বাক্যালাপ করতে পারবেন। তখন আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত ভিক্ষুসংঘকে বললেন– "বন্ধুগণ! তাবতিংস ভবনে বৈজয়ন্ত প্রাসাদের পূর্ব দিকে কেতুমতী নামে এক বিমান আছে। সেখানে মহাসেন নামক দেবপুত্র বাস করেন। তিনি মিলিন্দ রাজার সাথে বাক্যালাপ করতে ও তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করতে সমর্থ হবেন। একথা শুনার পর কোটিশত অর্হৎ যুগন্ধর পর্বত হতে

অন্তর্হিত হয়ে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হন। তাবতিংস স্বর্গের দেবরাজ ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র বা দেবরাজ শক্র। দেবরাজ শক্র ভিক্ষুগণকে অবলোকন করে তাদের স্বর্গে আসার কারণ জানতে চান। আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত দেবেন্দ্র শক্রকে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে বললেন। সাগল নগরের রাজা মহাবিতন্ডবাদী, দুর্ধর্ষ, দুঃসহ। তিনি তর্ক-বিতর্কে তীর্থঙ্করদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যলোকে এমন কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু নাই যিনি মিলিন্দরাজকে তর্কে পরাজিত করতে পারেন। দেবরাজ শক্র সমস্ত কথা শুনার পর দেবপুত্র মহাসেন এর নিকট গিয়ে অনুরোধ করতে বললেন, যাতে করে দেবপুত্র মহাসেন মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করে মিলিন্দরাজের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। দেবরাজ শক্র কেতুমতী বিমানে প্রবেশ করে দেবপুত্র মহাসেনকে সমস্ত কথা জানালেন। কিন্তু মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন প্রথমে মহাসেন। বহু পুণ্যের ফলে জন্ম-জন্মান্তরে মহৎ কর্ম সম্পাদন করার পর মহাসেন দেবপুত্র রূপে কেতুমতী বিমানে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখন তিনি নির্বাণগামী হওয়ার পথে। কিন্তু মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করলে তাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট, জরাজীর্ণ, রোগ-শোক ভোগ করতে হবে। দেবরাজ শক্র পরপর তিনবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কথায় অটুট থাকলেন। এরপর আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের শ্রী বৃদ্ধির জন্য মহাসেনকে অনুরোধ জানালেন। একমাত্র দেবপুত্র মহাসেনই পারেন যিনি তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে মিলিন্দরাজকে পরাজিত করতে। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে রাজা মিলিন্দের যে মিথ্যা দৃষ্টি, তা দমন করে বুদ্ধ শাসনের শ্রী বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা একমাত্র মহাসেন দেবপুত্রেরই আছে। বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অবশেষে মহাসেন মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে রাজি হন।

মহাসেন তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেবলোক থেকে চ্যুত হয়ে 'কজঙ্গল' নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই ব্রাহ্মণের নাম ছিল সোনুত্তর। মহাসেন মাতৃকুক্ষিতে উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে তিনটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো:

(১) অস্ত্রশস্ত্র প্রজ্বলিত হল,

(২) প্রধান শস্য পরিপক্ক হল,

(৩) আর মহামেঘ প্রচুর বর্ষণ করল।

দশ মাস গত হলে ব্রাহ্মণী পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তাঁর নাম রাখা হলো নাগসেন। নাগসেন ক্রমশ: বড় হয়ে সাত বছরে বয়স্ক হলো। একদিন নাগসেনের পিতা নাগসেনকে বললেন ব্রাহ্মণ কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করতে। ব্রাহ্মণকুলের শিক্ষনীয় বিষয় ছিল ত্রিবেদ শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষা। নাগসেনের শিক্ষা দানের জন্য সোনুত্তর একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ আচার্যকে এক সহস্র মুদ্রা গুরু-দক্ষিণা দিয়ে গৃহের পাশে এক প্রান্তে মঞ্চক স্থাপন করে দিলেন। যাতে করে নাগসেনের শিক্ষালাভে কোন রূপ অসুবিধা না হয়। ছোট বেলা থেকেই নাগসেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ম স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। বালক নাগসেন খুব কম সময়েই ত্রিবেদে পারদর্শী হয়ে উঠলেন।

নাগসেনের প্রব্রজ্যা

পূর্বেই বলা হয়েছে বালক নাগসেন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তিনি মন্ত্র শিক্ষা থেকে শুরু করে বেদ-মন্ত্র, শব্দজ্ঞান, ছন্দজ্ঞান, ভাষাজ্ঞান অর্থাৎ ইতিহাসসহ ত্রিবেদে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি পদক, ব্যাকরণ, লোকায়ত ও মহাপুরুষ লক্ষণ শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত যখন কোটিশত বৌদ্ধ ভিক্ষু নিয়ে তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন দেবপুত্র মহাসেনের নিকট। তখন রোহণ নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু উক্ত সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর এই অপরাধের জন্য শাস্তি স্বরূপ আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত রোহনকে বললেন, "বন্ধু! হিমালয় পর্বত পার্শ্বে 'কজঙ্গল' নামক এক ব্রাহ্মণদের গ্রাম আছে সেখানে সোনুত্তর ব্রাহ্মণ বাস করেন। সেই ব্রাহ্মণের নাগসেন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। আপনি সাত বৎসর দশ মাস ভিক্ষাচরণ করুন এবং নাগসেন বালককে বের করে প্রব্রজিত করুন। সে প্রব্রজিত হলে আপনি দণ্ডকর্ম হতে মুক্তি পাবেন।[১২] নাগসেনের জন্মের পর সাত বৎসর পর্যন্ত আয়ুষ্মান রোহন প্রতিদিন সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে যেতেন। এদিকে বালক নাগসেন সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলে তাঁর আচার্য ব্রাহ্মণ শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে বলে গৃহ ত্যাগ করেন। শিক্ষাগুরু চলে যাওয়ার পর বালক নাগসেন পূর্বজন্মের ফলের প্রভাবে ধ্যানে মগ্ন হন। ধ্যান অবস্থায় তিনি তাঁর অর্জিত বিদ্যার আদি, মধ্য ও অন্ত পর্যবেক্ষণ করলেন। কিন্তু সেখানে তিনি আদিতে, মধ্যে কিংবা অন্তে কোথাও একটুও সার না দেখে অতি উদ্বিগ্ন ও অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি অসন্তুষ্ট চিত্তে বলে উঠলেন, "অহো! এই সকল বেদ তুচ্ছ, নিতান্ত প্রলাপ মাত্র, অসার-নিঃসার।" আয়ুষ্মান রোহন ধ্যান চিত্তে নাগসেনের এ রকম চিন্তার কথা জানতে পারলেন। তিনি তখনই বালক নাগসেনের সাথে দেখা করতে 'কজঙ্গল' গ্রামে যান। এ সময় নাগসেন নিজের গৃহের দরজায় অবস্থান করছিলেন। তিনি দূর থেকেই আয়ুষ্মান রোহনকে আসতে দেখেন। তাঁকে দেখে নাগসেন অত্যন্ত খুশি হলেন। আর মনে মনে ভাবলেন এই মস্তক মুণ্ডিত প্রব্রজিতের কাছে তিনি বহু বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাদের দু'জনের কথোপকথনের এক পর্যায় নাগসেন জানতে পারেন, সকল পাপরূপ ময়লা দূর করার জন্যই আয়ুষ্মান রোহন প্রব্রজিত হয়েছেন। আয়ুষ্মান রোহণের কথা শুনে বালক নাগসেন তাঁর কাছে মন্ত্র শিক্ষা লাভ করতে চান। কিন্তু রোহন বললেন কেবল প্রব্রজিত হলেই তিনি নাগসেনকে শিক্ষা দান করবেন। বালক নাগসেন তার পিতা-মাতার আদেশ নিয়ে আয়ুষ্মান রোহনের কাছে প্রব্রজিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। আয়ুষ্মান রোহন নাগসেনকে নিয়ে বর্তনীয় আশ্রমের বিজম্ভবত্থুতে গেলেন। তাঁর বিজম্ভবত্থুতে এক রাত থাকার পর আবার তাঁরা রক্ষিত তলে গমন করলেন। আয়ুষ্মান রোহন রক্ষিত তলে কোটিশত অর্হৎ এর সামনে নাগসেনকে প্রব্রজিত করলেন। নাগসেন প্রব্রজিত হওয়ার পর আয়ুষ্মান রোহন তাকে মন্ত্রদান করা শুরু করলেন। যেহেতু নাগসেন ত্রিবেদে পারদর্শি ছিলেন এবং পণ্ডিত সম্পন্ন বালক ছিলেন। তাই আয়ুষ্মান রোহন তাঁকে সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্মের মধ্যে অভিধর্ম শিক্ষা আগে দিলেন।

নাগসেন কুশল ধর্ম, অকুশল ধর্ম ও অব্যাকৃত ধর্ম এই ত্রিক ও দ্বিক প্রতিমণ্ডিত (১) ধমসঙ্গণি প্রকরণ; স্কন্ধ বিভঙ্গাদি অষ্টাদশ বিভঙ্গে প্রতিমণ্ডিত (২) বিভঙ্গ প্রকরণ; সংগ্রহ অসংগ্রহ ইত্যাদি চতুর্দশ ভাগে বিভক্ত (৩)

ধাতুকথা প্রকরণ; স্কন্ধ প্রজ্ঞপ্তি, আয়তন প্রজ্ঞপ্তি প্রভৃতি ছয় প্রকারে বিভক্ত (৪) পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি প্রকরণ; স্বমতের পঞ্চশত সূত্র, পরমতের পঞ্চশত সূত্র এই সহস্র সূত্রের সম্মিলিত আলোচনা (৫) কথাবত্থু প্রকরণ; মূল যমন, স্কন্ধ যমকাদি দশ প্রকারে বিভক্ত (৬) যমক প্রকরণ; হেতু প্রত্যয়, আরম্মণ প্রত্যয়াদি চব্বিশ প্রকারে বিভক্ত (৭) পট্‌ঠান প্রকরণ; এই সমগ্র অভিধর্ম পিটক একবার শুনেই শিক্ষা লাভ করলেন ও মুখস্থ করলেন। বালক নাগসেন মাত্র একবার শুনেই সমগ্র অভিধর্ম পিটক আয়ত্ত ও অনুধাবন করতে পারলেন। দ্বিতীয়বার আর পাঠ করার দরকার হয়নি। আয়ুষ্মান নাগসেন কোটি শত অর্হৎগণের সামনে কুশল ধর্ম, অকুশল ধর্ম ও অব্যাকৃত ধর্ম এই তিন পদ অবলম্বন করে সমস্ত অভিধর্ম পিটক বিস্তারিত বর্ণনা করতে লাগলেন। সাতমাস ধরে তিনি অভিধর্ম পিটক ভিক্ষুগণের সামনে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিলেন। এ সময় পৃথিবী কম্পিত হলো, দেবতারা সাধুবাদ জানালো, ব্রহ্মগণ করতালি দিলেন, দিব্য চন্দন, চূর্ণ ও মন্দার পুষ্পারাশি প্রবর্ষিত হলো। বিশ বছর পূর্ণ হলে কোটিশত অর্হৎসেন রক্ষিততলে আয়ুষ্মান নাগসেনকে উপসম্পদা প্রদান করেন।

নাগসেনের অপরাধ ও দণ্ডকর্ম

উপসম্পদা গ্রহণ করার পর নাগসেন ভিক্ষুদের শীল অনুযায়ী পূর্বাহ্ন সময়ে ভিক্ষা অর্জনের জন্য গ্রামে প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁর সাথে আরও বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। এই সময় তাঁর মনে চিন্তা আসলো তাঁর গুরু রোহন আসলে মূর্খ, তুচ্ছ। কেননা যেখানে মহামানব গৌতমবুদ্ধের উপদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ, সেখানে আয়ুষ্মান রোহন তাঁকে অভিধর্ম শিক্ষা দিলেন। এই সময় আয়ুষ্মান রোহন ছিলেন ধ্যানে মগ্ন। তিনি ধ্যান অবস্থায় নাগসেনের মনের এই বিতর্কিত কথা জানতে পারেন। তখন আয়ুষ্মান রোহন নিজ ধ্যানবলে নাগসেনের মনে দেখা দিয়ে বললেন, নাগসেন তোমার মনে অন্যায় বিতর্কের জন্ম হয়েছে। এ রকম বিতর্ক মনে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন নাগসেনকে। কিন্তু নাগসেন তার কোন উত্তর দিতে পারলেন না। এ সময় নাগসেনের মনে হলো আমার উপাধ্যায় নিজের চিত্ত দ্বারা অন্যের চিত্তের কথা জানতে পারেন। নিজ চিত্ত বলে অন্যের চিত্তে দেখা দিতে পারেন। তাই উপাধ্যায় একজন বড়ই পণ্ডিত। নাগসেন একথা ভেবে আয়ুষ্মান রোহনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নাগসেন বললেন, "ভন্তে আমাকে ক্ষমা করুন, আর কখনো এমন চিন্তা করবো না।" কিন্তু আয়ুষ্মান রোহন নাগসেনকে ক্ষমা করলেন না। বরং নাগসেনকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন। সাগল নগরের মিলিন্দরাজকে যদি তর্কে নাগসেন পরাজিত করতে পারেন, তবেই নাগসেনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে। নাগসেন তর্কে মিলিন্দরাজকে পরাজিত করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন। একথা শুনার পর রোহন স্থবির নাগসেনকে সঙ্ঘরাজ অশ্বগুপ্তের কাছে বর্ষাবাস যাপনের জন্য প্রেরণ করেন। অশ্বগুপ্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কি কি বলতে হবে তা সমস্ত কথা নাগসেনকে বলে দেন রোহন স্থবির। আয়ুষ্মান নাগসেন মাননীয় রোহনে স্থবিরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্বক পাত্র চীবর নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তিনি বর্তনীয় আশ্রমে পৌছালেন। যেখানে সংঘরাজ অশ্বগুপ্ত অবস্থান করছিলেন। নাগসেন অশ্বগুপ্তকে প্রণাম করে এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন। আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত নাগসেনের পরিচয়

জানতে চাইলেন। মিলিন্দপ্রশ্ন অনুসারে নাগসেন দাঁড়িয়ে বললেন- "ভন্তে! আমার উপাধ্যায় আপনার পাদপদ্মে নতশিরে প্রণাম জানিয়েছেন এবং আপনার নিরাময়, নিরাতঙ্ক, প্রফুল্লভাব, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমার উপাধ্যায় তিনমাস আপনার সাথে বাস করার জন্য পাঠিয়েছেন।"

আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত বললেন– "তোমার নাম কী?"

"ভন্তে! আমার নাম নাগসেন।"

"তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি?"

"ভন্তে আমার উপাধ্যায়ের নাম রোহন স্থবির।"

"আমার নাম কি?"

"ভন্তে! আপনার নাম আমার উপাধ্যায় জানেন।"

"উত্তম, নাগসেন! নিজের পাত্র-চীবর সামলিয়ে রাখ।"

"সাধু, ভন্তে।"

নাগসেন পাত্র-চীবর রেখে পরের দিন বর্তনী আশ্রম ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে যথাস্থানে মুখ ধোয়ার জল ও দন্তকাষ্ঠ রেখে দিলেন। স্থবির পুনরায় ঝাড়ু দেওয়া স্থান ঝাড়ু দিলেন, মুখ ধোয়ার জল ফেলে পুনরায় জল রাখলেন, সেই দন্তকাষ্ঠ ফেলে অন্য দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করলেন এবং তাদের মধ্যে আর কোন প্রকার কথা হলো না। এভাবে সাতদিন অতিবাহিত হলে পুনরায় সেই প্রশ্নগুলো নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন।

নাগসেন ঠিক আগের মতই উত্তর দিলেন। এবার আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত নাগসেনকে বর্ষাবাস যাপনের অনুমতি প্রদান করলেন। ত্রিশ বছর ধরে এক মহাউপাসিকা আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্তের সেবা করতেন। একদিন বর্ষাবাস যাপনকালে সেই মহাউপাসিকা আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত ও নাগসেনকে তাঁর বাড়িতে ভোজন করার জন্য দাওয়াত দিলেন। ভোজন শেষে নাগসেন উপাসিকার কথা মতো তাকে ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি অভিধর্মের গভীর তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন। আর সেই মহাউপাসিকা তাঁর নৈর্বাণিক দেশনা শুনে অর্হত্ব ফল লাভ করলেন। তখন আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত নিজ আসনে বসা অবস্থায় দু জনেরই ধর্মজ্ঞান লাভের বিষয় অবগত হয়ে সাধুবাদ দিলেন- "সাধু, সাধু নাগসেন! তুমি এক বাণে দুই মহাকায় বিদীর্ণ করলে।" তাঁদের এই দৃশ্য দেখে দেবলোকে দেবতারাও সাধুবাদ জানালো। এরপর আয়ুষ্মান নাগসেন আসন ছেড়ে মাননীয় অশ্বগুপ্ত স্থবিরের কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে এক প্রান্তে বসলেন।

নাগসেনের পাটলিপুত্রে গমন ও অর্হত্ব লাভ

স্রোতাপত্তি ফল লাভের পর এবং বর্ষাবাস যাপন শেষে আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত নাগসেনকে পাটলিপুত্রে যাওয়ার নির্দেশ দেন। পাটলিপুত্র নগরের অশোকারাম বিহারে আয়ুষ্মান ধর্মরক্ষিত বাস করেন। তাঁর কাছে বুদ্ধবাণী সম্পর্কে অধ্যয়ন করার জন্য নাগসেন যাত্রা শুরু করেন। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' অনুসারে পাটলিপুত্র ছিল বর্তনীর আশ্রম থেকে একশত যোজন।[১৩] পাটলিপুত্র বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশের পাটনা নামে পরিচিত। এটি ছিল মগধ রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিলো রাজগৃহ। পাটলিপুত্ত নগরী পুষ্ফপুর, কুসুমপুর ও পলিব্রোথ নামে পরিচিত ছিল।[১৪] তথাগত বুদ্ধের সময় 'পাটলি' নামক গ্রামে মগধরাজ অজাতশত্রু কর্তৃক নগরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫] চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর মতে প্রচুর পটল বৃক্ষের সমারোহে নগরটি পত্তন হওয়ায় এর নাম পাটলিপুত্ত বা পাটলিপুত্র (পটল বৃক্ষের পুত্র) হয়েছে।[১৬] খ্রি: পূ: ৩য় শতকে এটা সম্রাট অশোকের রাজধানী ছিলো। এর পূর্বে তা ছিলো শিশুনাগ বংশের রাজা নন্দের শাসনাধীন। গুপ্ত বংশের সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পাটলিপুত্ত বিজয়ের পর একে সাধারণ নগরে পরিণত করেন। অবশ্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনামলে নগরটি পুনরুজ্জীবন লাভ করে এবং খ্রি: ৬ষ্ঠ শতকে হুনদের আক্রমণের প্রাক্কাল পর্যন্ত সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। এখানে তথাগত বুদ্ধের ব্যবহৃত কটিবন্ধন ও জলপাত্র সমাহিত রাখা হয়েছিল।[১৭]

আয়ুষ্মান নাগসেন মাননীয় অশ্বগুপ্ত স্থবিরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে পাত্র চীবর নিয়ে পাটলিপুত্রে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। সে সময় পাটলিপুত্রের এক বণিক পঞ্চশত শকটসহ পাটলিপুত্রে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করছিলেন। বণিক নাগসেনকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কোথায় যাচ্ছেন? নাগসেনও পাটলিপুত্রে গমন করছেন একথা শুনার পর বণিক তাঁকে তার সাথে যেতে বললেন। তিনি আয়ুষ্মান নাগসেনের আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দ্বারা নাগসেনকে ভোজন করান। পথের মধ্যে আয়ুষ্মান নাগসেন বণিককে অভিধর্ম ও বুদ্ধ শাসন সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও উপদেশ দিলেন। বণিক আয়ুষ্মান নাগসেনের উপদেশ শুনে ধর্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। অবশেষে বণিক নাগসেনকে একটি কম্বল দান করলেন এবং অশোকারামের কাছে শকট থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। এরপর নাগসেন অশোকারামে প্রবেশ করে ভদন্ত ধর্মরক্ষিতের সাথে দেখা করলেন। আয়ুষ্মান নাগসেন তিন মাসের মধ্যে ভদন্ত ধর্মরক্ষিতের কাছে ত্রিপিটক, বুদ্ধবচন এক আবৃত্তিতেই মুখস্ত করেন। তিন মাসের মধ্যে তিনি এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করলেন। আয়ুষ্মান ধর্মরক্ষিত নাগসেনকে বললেন– "নাগসেন! গোপাল যেমন গাভীগুলো কেবল পালন করে, কিন্তু দুধপান করে অন্য লোকে। তেমনি তুমি ত্রিপিটক বুদ্ধবচন জানা সত্ত্বেও শ্রামণ্য ফলের অধিকারী হওনি।"

সেই দিবা ও রাত্রির মধ্যেই নাগসেন প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ব লাভ করেন।

আয়ুষ্মান নাগসেনের এই সত্যোপলব্ধির সাথে সাথে পৃথিবী কেঁপে উঠলো, স্বর্গের দেবতারা সাধুবাদ জানাল, ব্রহ্মাগণ আনন্দে করতালি দিলেন; দিব্য চন্দনচূর্ণ ও মন্দার পুষ্প বর্ষণ হলো। এর কিছুদিন পরই আয়ুষ্মান

নাগসেনকে রক্ষিততলে আসার জন্য কোটিশত ভিক্ষুর ডাক পড়লো। যথাসময়ে নাগসেন রক্ষিততলে উপস্থিত হন। সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁকে অভিনন্দন জানান। অর্হৎগণ আয়ুষ্মান নাগসেনকে অনুরোধ জানান যাতে করে তিনি মিলিন্দরাজকে পরাজিত করে বৌদ্ধ শাসনের শ্রীবৃদ্ধি করেন। নাগসেন অর্হৎগণের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং মিলিন্দরাজের সাথে বাক-আলাপ করার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের সাক্ষাৎকার

এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে রাজা মিলিন্দ ধর্মালোচনা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য মনোবাসনা পোষণ করলেন। এই সময় ত্রিপিটকধারী আয়ুপাল নামে এক স্থবির সংখেষ্য পরিবেণে অবস্থান করছিলেন। রাজা আয়ুপালের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে আয়ুষ্মান আয়ুপাল তাতে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু বাক-তর্কের এক পর্যায়ে আয়ুষ্মান আয়ুপাল রাজা মিলিন্দের নিকট পরাজয় বরণ করেন।

সেই সময় আয়ুষ্মান নাগসেন শ্রমণসংঘের সাথে গ্রাম, নগর ও রাজধানীতে ভিক্ষা করতে করতে ক্রমশঃ সাগল নগরে পৌঁছালেন। তিনি সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, জ্ঞান, যশস্বী, বহুলোকের সম্মানিত, পণ্ডিত, চতুর, বুদ্ধিমান, নিপুণ, বিজ্ঞ, প্রভাবশালী, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ত্রিপিটকজ্ঞ, বেদ-পারগ, প্রত্যুৎপন্নমতি, আগমবিদ্, প্রতিসম্ভিদাসম্পন্ন, শান্তার নবাঙ্গ শাসন হৃদয়ঙ্গত, পারমীপ্রাপ্ত, জিনবচনে ধর্ম-অর্থ-দেশনা-প্রতিবেধ-কুশল, অক্ষয় বিচিত্র প্রতিভাসম্পন্ন, বিচিত্র বক্তা, কল্যাণভাষী, দুরবগাহ, দুঃসহ ও দুর্নিবার ছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন থেকে কঠিনতর ছিল। তিনি সাগরের মতো প্রশস্ত, হিমালয় সদৃশ নিশ্চল, নিস্কলুষ, অবিদ্যারূপ অন্ধকার নাশক, জ্ঞানালোকে বিকাশক, মহাবক্তা, অন্যমতাবলম্বীকে পরাজয়কারী, অপরতীর্থিক মর্দনকারী ছিলেন। তাঁকে তর্ক দ্বারা পরাজয় করা সম্ভব ছিলো না।

নাগসেন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা ও রাজ মহামাত্য সকলের দ্বারা সম্মানিত, গৌরবান্বিত, মানিত, পূজিত ও অর্চিত হন। চীবর-পিন্ডপাত, শয়নাসন, রোগপ্রত্যয়-ভৈষজ্য, অগ্রলাভ ও অগ্রযশ প্রাপ্ত, ধর্মোপদেশ শ্রবণের ইচ্ছায় আগত বৃদ্ধ ও বিজ্ঞগণকে বুদ্ধের ধর্মরত্নের নবাঙ্গ প্রদর্শক, ধর্মমার্গের উপদেশক, ধর্মালোকের ধারক, ধর্মপতাকার উত্তোলনকারী, ধর্মশঙ্খবাদক, ধর্মভেরী প্রহারক, সিংহনাদকারী, বজ্রের মতো গর্জনকারী, মধুর-বাণী ভাষী, উত্তম জ্ঞান-রূপ বিদ্যুজ্জাল পরিবেষ্টিত। তিনি করুণারূপ জলপূর্ণ মহৎ ধর্মামৃত মেঘের বর্ষণ দ্বারা সমগ্র জগতকে পরিতৃপ্ত করতে করতে গ্রাম, নগর, রাজধানীতে বিচরণ করে ক্রমান্বয়ে সাগল নগরে উপস্থিত হন। তিনি আশি সহস্র ভিক্ষুর সাথে সংখেষ্য পরিবেণে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখানকার জনগণকে ধর্ম-দেশনা দিচ্ছিলেন। নাগসেন ছিলেন চার প্রতিসম্ভিদায় পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত স্থবির। রাজা মিলিন্দ রাজ্য কাজ পরিচালনা করার সময় অনন্তর দেবমন্তিয় তাঁকে নাগসেনের কথা জানালেন। মিন্দিরাজ আয়ুষ্মান নাগসেনের কথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং বাক-তর্কালাপ করার জন্য উৎসাহী হলেন। রাজা মিলিন্দ নাগসেন নাম শুনে কিছুটা ভীত হলেন এবং তাঁর প্রতি আগ্রহী হলেন। ভদন্ত নাগসেনের কাছে দূত প্রেরণ করলে নাগসেন মিলিন্দরাজের সাথে দেখা করতে

সম্মতি প্রদান করেন। এরপর রাজা মিলিন্দ পাঁচশত যবন পরিবৃত নিয়ে সর্বোত্তম রথে আরোহন করে বিপুল পরিমাণ সৈন্য-বাহিনী নিয়ে পরিবেণে আয়ুষ্মান নাগসেনের কাছে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে আয়ুষ্মান নাগসেন আশি হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ সম্মেলন গৃহে বসেছিলেন। রাজা মিলিন্দ দূর থেকে আয়ুষ্মান নাগসেনের পরিষদ পর্যবেক্ষণ করলেন। এই মহাপরিষদ দেখে মিলিন্দের ভয় হলো। তাঁর কিছুটা বুদ্ধি লোপ পেল। তিনি আয়ুষ্মান নাগসেনের সাথে বাক্যালাপ করার জন্য রোমাঞ্চিত হলেন। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থ অনুসারে এখানে রাজা মিলিন্দের অবস্থা প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে-

তিনি গন্ডার পরিবেষ্টিত গজের ন্যায়, গরুড় পরিবেষ্টিত সর্পের ন্যায়, অজগর পরিবেষ্টিত শৃগালের ন্যায়, মহিষ পরিবেষ্টিত ভল্লুকের ন্যায়, সর্পানুধাবিত ভেকের ন্যায়, ব্র্যাঘ্রানুধাবিত মৃগের ন্যায়, অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) গৃহীত সর্পের ন্যায়, মার্জার গৃহীত ঈঁদুরের ন্যায়, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায়, জালে আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায়, হিংস্র পশু সমাকুল অরণ্যে প্রবিষ্ট মানুষের ন্যায়, বৈশ্রবণের প্রতি অপরাধকৃত যক্ষের ন্যায় এবং ক্ষীণ আয়ু দেবপুত্রের ন্যায় ভীত, উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত্র, সংবিগ্ন, রোমাঞ্চিত, বিমনা, দুর্মনা, ভ্রান্তচিত্ত ও বিপরিণতচিত্ত হলেন। রাজা মিলিন্দ মনে মনে ভাবলেন এই ব্যক্তি যেন তাঁকে পরাজিত না করেন। জীবনে তিনি কোন দিন কারো কাছে পরাজিত হন নি। তাই তিনি সাহস অর্জন করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আয়ুষ্মান নাগসেন যখন তাঁর আসনে বসেছিলেন, তখন সেখানে সম্মুখে চল্লিশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন, আর পিছনে বসা চল্লিশ হাজার ভিক্ষুর মধ্যে বয়োজোষ্ঠ ছিলেন। রাজা মিলিন্দ ভিক্ষু সংঘের সামনে, মধ্যে ও পিছনে ভালো করে দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন একজন কেশরী সিংহের মতো নির্ভীক, নিরাতঙ্ক, নিঃসংকোচ চিত্তে বসে আছেন। রাজা তাঁর ভাব-ভঙ্গিতেই বুঝতে পারেন, ইনি হলেন সেই নাগসেন। মিলিন্দরাজ দেবমন্তিয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি সেই নাগসেন কি-না? দেবমন্তিয় বললেন, ইনিই নাগসেন। রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে দেখে কিছুটা ভীত হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন জীবনে তিনি বহু আচার্য, পণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ দেখেছেন কিন্তু এরকম মহাপ্রজ্ঞাবান, সদাচার সম্পন্ন আচার্য দেখেন নি। মিলিন্দরাজের চিত্ত অস্থির হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন আজ তাঁর নাগসেনের কাছে পরাজয় বরণ করতে হবে। এরপর রাজা মিলিন্দ আয়ুষ্মান নাগসেনের সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সাথে অভিনন্দন ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ পূর্বক এক প্রান্তে বসলেন। আয়ুষ্মান নাগসেনও প্রত্যাভিনন্দন দ্বারা রাজা মিলিন্দের চিত্ত প্রসন্ন করলেন। মিলিন্দরাজ আয়ুষ্মান নাগসেনকে তিনি কি নামে পরিচিত, জিজ্ঞাসা করলেন। নাগসেন প্রত্যুত্তরে জানাল, তাঁর বন্ধুমহল তাঁকে নাগসেন বলে অভিহিত করেন। তাঁর বাবা-মা তাঁর নাম রেখেছেন নাগসেন। প্রকৃতপক্ষে 'নাগসেন' 'সূরসেন', 'বীরসেন' প্রভৃতি অভিধা বা ব্যবহার মাত্র।[১৮] এর দ্বারা কোন পুরুষ, আত্মা বা পুদ্গল বিশেষের উপলব্ধি হয় না। তখন মিলিন্দ নাগসেনকে পুদ্গলের অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করে জর্জরিত করে তুলেন। নাগসেন খুব সুন্দর করে মিলিন্দরাজকে পুদ্গলের অনস্তিত্ব বুঝিয়ে দেন। স্থবির রাজাকে বলেন যে, ঈষা, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর, রথদণ্ড, যুগ, রজ্জু, যষ্ঠি প্রভৃতি নিয়ে যেমন রথ নামে

পরিচিত হয়। তেমনি কেশ, লোম, নখ, দাঁত, অস্তি, মাংস প্রভৃতির মিলনে জীব বা নাগসেন হয়। এটা কেবল একত্রে ব্যবহার মাত্র।

পরমার্থত: জীবের কোন অস্তিত্ব নেই। এরপর রাজা মিলিন্দ নাগসেনের সাথে তর্ক করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। আয়ুষ্মান নাগসেন পণ্ডিতের মতো রাজার সাথে তর্ক করতে সম্মত হন। তখন রাজা মিলিন্দ একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। নাগসেনও রাজাকে যথাযথ এর উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করেন।

তথ্য নির্দেশঃ

(১) মিলিন্দ প্রঞঞ (১ম খণ্ড): বিধুশেখর ভট্টাচার্য; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-১৯৯৫, পৃ. ৫।

(২) Mahavamsa: Geiger's translation; P.T.S London, 1912, P.194.

(৩) Milindaparha: Pali Text Society; 1880, P. 82-83.

(৪) Mahavamsa: Geiger's translation; P.T.S. London, P.199

(৫) Apadana: Pali Text Society; i. P. 359.

(৬) Milinda Panha: Pali Text Society; 1880, P.327.

(৭) মিলিন্দপ্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ): পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৩।

(৮) প্রাগুক্ত; পৃ. xxiii

(৯) প্রাগুক্ত; পৃ. ৪।

(১০) বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস: ড. মণিকুন্তলা হালদার (দে); মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা ১৯৯৬, পৃ. ১২-১৩

(১১) A History of Pre-Buddhistic Philosophy: B.M. Barua; University of Calcutta, 1921, P. 301-18

(১২) প্রাগুক্ত; পৃ. ৭

(১৩) প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪

(১৪) Mahavamsa: Pali Text Society; 1908. Chap 18; Mahavastu, ed.E. Senart, Paris, 1882-97 iii.x P. 231

(১৫) Digha-Nikaya: Pali Text Society; ii. P. 86; Digha-Nikaya Attakatha (Sumangalavilasini), Pali Text Society.

(১৬) Buddhist Records of the Western World; S. Beal; London, 1884 (Reprinted, Delhi, 1981), ii P. 85

(১৭) Buddhavamsa: Pali Text Society. xxviii. P.9

(১৮) প্রাগুক্ত; পৃ.২১

তৃতীয় অধ্যায়

‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত পর্যালোচনা

‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু হলো মহামানব গৌতম বুদ্ধের বাণী ও ধর্মদেশনার উপর ভিত্তি করে রাজা মিলিন্দ ও আয়ুষ্মান নাগসেনের কথোপকথন। গ্রন্থটিতে রাজা মিলিন্দের প্রশ্ন ও নাগসেনের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে বৌদ্ধ দর্শনের জটিল তত্ত্বকথাসমূহ খুব সহজ সরল ভাষায় বিভিন্ন উপমার সাহায্যে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা পূর্বেই জেনেছি সমগ্র গ্রন্থটিতে ছয়টি বিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। যথা-

পূর্বযোগ;

মিলিন্দ-প্রশ্ন;

লক্ষণ-প্রশ্ন;

মেন্ডক-প্রশ্ন;

অনুমান-প্রশ্ন;

উপমাকথা-প্রশ্ন।

এছাড়াও ‘বিমতিচ্ছেদন-প্রশ্ন’ এবং মহাবর্গযোগিকথা’ এই দুইটি বিভাগেরও উল্লেখ দেখা যায়। গ্রন্থটিতে ৬টি বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা হয়নি। কোন কোন বিভাগে দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়, আবার কোন কোন বিভাগ স্বল্প কথায় সমাপ্ত হয়েছে।

● পূর্বযোগ

‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হলো ‘পূর্বযোগ’। পূর্বযোগ কথার অর্থ হলো- তাদের পূর্বজন্মে কৃত কর্ম। অর্থাৎ রাজা মিলিন্দ ও আয়ুষ্মান নাগসেনের পূর্ব জন্মের কর্মের কথা এ বিভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীনকালে ভগবান কাশ্যপ-বুদ্ধের শাসনের সময় গঙ্গানদীর কাছে এক আশ্রমে এক বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ বাস করতো। সেখানে ব্রত শীলসম্পন্ন ভিক্ষুগণ প্রাত:কালেই গাত্রোত্থান করে যষ্ঠি সন্মার্জনী নিয়ে বুদ্ধের গুণাবলী চিন্তা করতে করতে অঙ্গন সন্মার্জন করতেন এবং আবর্জনাগুলো স্তূপীকৃত করতেন। প্রতি দিনের মতো একদিন এক ভিক্ষু কোন শ্রামণেরকে বললেন- এখানে এস, শ্রামণের। এই আবর্জনাগুলো ফেলে দাও। সে না শোনার মত ভান করে চলে যায়। দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বার আমন্ত্রিত হয়েও সে না শোনার ভান করে অথবা অন্য মনস্ক হয়ে চলে যায়। এরপর সেই ভিক্ষু “এই শ্রামণের বড়ই অবাধ্য” চিন্তা করে ক্রোধবশত সন্মার্জনী দন্ডের দ্বারা তাকে প্রহার করলেন। তখন সে রোদন করতে করতে ভয়ে আবর্জনা ফেলবার সময়- “এই আবর্জনা নিক্ষেপ জনিত পূর্ন্যকর্ম প্রভাবে যে পর্যন্ত আমি নির্বাণ লাভ না করি, এ মধ্যে যে যে স্থানে জন্মধারণ করি না কেন আমি যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো সমর্থ ও মহাতেজস্বী হই” –প্রথমত: এই রকম প্রার্থনা করল।

আবর্জনা পরিষ্কার করে সে স্নানের জন্য গঙ্গা নদীর ঘাটে যায়। গঙ্গার গড়গড় শব্দায়মান তরঙ্গবেগ দর্শন করে "যাবৎ আমি নির্বাণ প্রাপ্ত না হই তাবৎ জন্মে জন্মে যেন এই তরঙ্গবেগের মতো প্রত্যুৎপন্ন ও অক্ষয় প্রতিভাসম্পন্ন হতে পারি" –এই বলে দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করল। সেই ভিক্ষুও সন্মার্জনী ঘরে রেখে স্নানের নিমিত্ত গঙ্গ তীরে যাওয়ার সময় শ্রামণেরের প্রার্থনা শুনলেন এবং চিন্তা করলেন- "এই শ্রামণের আমার দ্বারা নিয়োজিত হয়েও যদি এমন প্রার্থনা করে তবে আমার প্রার্থনা কেন সিদ্ধ হবে না?" এই চিন্তা করে তিনিও প্রার্থনা করলেন- "যত দিন আমি নির্বাণ প্রাপ্ত না হই, ইতিমধ্যে জন্মে জন্মে আমি যেন গঙ্গার তরঙ্গবেগের মতো অক্ষয়-প্রত্যুৎপন্নমতি হই, এর দ্বারা জিজ্ঞাসিত সর্ববিধ জটিল প্রশ্নকে নির্জটিল করতে ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হই।

তাঁদের উভয়ই দেবলোক ও মনুষ্যলোক সংসরণ করতে করতে এক বুদ্ধান্তর কাল গত করলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ যেমন মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবির সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তেমনি এদের সম্বন্ধেও করেছিলেন, "আমার পরিনির্বাণের পঞ্চশত বৎসর পর এরা দুজন জন্মগ্রহণ করবে, আর যে সকল ধর্ম বিনয় আমি সূক্ষ্মভাবে উপদেশ করেছি, তাঁরা তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উপমা যুক্তিবলে সরল স্পষ্ট করে বিভাগ করবে।" এদের মধ্যে শ্রামণের জম্বুদ্বীপের 'সাগল' নামক নগরে মিলিন্দ নামে রাজা হলেন। তিনি বড় পণ্ডিত, চতুর, মেধাবী ও ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান মন্ত্র ও যোগবিধান ক্রিয়ার আচরণ করবার পরীক্ষা করতেন। তিনি ঊনবিংশতি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি যেমন ধনাঢ্য ছিলেন, তেমনি তার্কিক ছিলেন। তর্কযুদ্ধে তাকে কেউ পরাজিত করতে পারতো না। সেই সময় ছয়শত ধর্মগুরু ছিলেন: (১) পূরণ কাশ্যপ, (২) মুক্‌খলি গোশাল, (৩) নিগণ্ঠ নাতপুত্র, (৪) সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্র, (৫) অর্জিত কেশকম্বলী ও (৬) পুকুধ কচ্চায়ন।[২] কিন্তু এরা কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতো না। তিনি একে একে রাজ্যের সকল শ্রমণ, ভিক্ষুকে পরাজিত করেন। এ রকম অবস্থা দেখে আয়ুষ্মান অশ্বগুপ্ত কোটিশত অরহত তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন এবং কেতুম বিমানে অবস্থান করছিলেন দেবপুত্র মহাসেন। মহাসেনকে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মিলিন্দরাজ্যের মিথ্যা দৃষ্টি দূর করে বুদ্ধ শাসনের শ্রীবৃদ্ধি করার অনুরোধ জানান। অবশেষে বুদ্ধ শাসনের শ্রীবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে দেবপুত্র মহাসেন মনুষ্যলোকে 'কজঙ্গল' গ্রামে সোনুত্তর নামক এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম রাখা হয় নাগসেন। রোহন স্থবির কোটিশত অর্হৎ ভিক্ষুর সাথে স্বর্গে গমন না করার জন্য শাস্তি স্বরূপ নাগসেনকে প্রব্রজিত করার দায়িত্ব পান। ঘটনাক্রমে নাগসেন রোহনের কাছে সাত বছর বয়সে প্রব্রজিত হয়ে অভিধর্মসহ ধর্মশাস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। একদিন ভীক্ষান্ন সংগ্রহ করার সময় বালক নাগসেনের মনে উপাধ্যায় রোহনের দীক্ষা নিয়ে সন্দেহ মনে আসলে রোহন স্বীয় ধ্যানবলে তা অবগত হয়ে নাগসেনকে মিলিন্দ রাজকে তর্কে পরাজিত করে গুরু দক্ষিণা দিতে বলেন।[৩] অবশেষে নাগসেন অশ্বগুপ্তের কাছে দীক্ষা নিয়ে পাটলিপুত্রে গমন করেন। ভদন্ত ধর্মরক্ষিতের কাছে এবং সেখানে তাঁর কাছে ত্রিপিটক বুদ্ধবচন আবৃত করে কণ্ঠস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করেন। অবশেষে আশি হাজার শ্রমণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ মিলিন্দ রাজার রাজ্যের সংখেয্য পরিবেণে অবস্থান কালে রাজা মিলিন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

● মিলিন্দ-প্রশ্ন

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থের দ্বিতীয় বিভাগের নাম হলো 'মিলিন্দ-প্রশ্ন'। এ অধ্যায়ে দুটি ভাগ। যথা: লক্ষণ-প্রশ্ন ও বিমতিচ্ছেদন-প্রশ্ন। লক্ষণ-প্রশ্ন আবার তৃতীয় অধ্যায় হিসেবে গ্রন্থটিতে সংযুক্ত আছে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(ক) লক্ষণ-প্রশ্ন

'লক্ষণ-প্রশ্নে' চারটি বর্গ রয়েছে। প্রথম বর্গে কুশল ধর্মের লক্ষণ সমূহসহ বিভিন্ন প্রশ্ন এসেছে। দ্বিতীয় বর্গে পুনর্জন্ম ও নামরূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় বর্গে দ্বাদশ নিদানের বিষয় সমূহসহ বিতর্ক, বিচার প্রভৃতি বিষয় কথোপকথন হয়েছে। এছাড়াও চতুর্থ বর্গে স্পর্শাদি ধর্মসমূহ অবিভাজ্য সম্পর্কে যুক্তি তর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু 'লক্ষণ প্রশ্ন' মিলিন্দ প্রশ্নের তৃতীয় বিভাগ হিসেবেও আমরা পাই, তাই পরবর্তীতে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(খ) বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন

'বিমতিচ্ছেদন প্রশ্নে' পাঁচটি বর্গের উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে। যথা: প্রথম বর্গ, দ্বিতীয় বর্গ, তৃতীয় বর্গ, চতুর্থ বর্গ ও পঞ্চম বর্গ। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

প্রথম বর্গ

পঞ্চায়তন নানা কর্মসমুৎপন্ন, কর্মের নানাত্ব হেতু বৈষম্য, পূর্ব প্রচেষ্টা কার্যকরী, নরকাগ্নি উষ্ণতর, পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা, নিরোধই নির্বাণ, নির্বাণ লাভ ও নির্বাণের সুখ জানা বিষয়সমূহ সম্পর্কে রাজা মিলিন্দের প্রশ্ন ও নাগসেনের উত্তর দেওয়া হয়েছে। পঞ্চ আয়তন অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে নানা প্রকারের কর্ম উৎপন্ন হয়। এই পৃথিবীতে কেউ ধনী, কেউ গরিব, কেউ বড়, কেউ ছোট, কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত প্রভৃতির কারণ হলো মানুষের কর্মফল। পৃথিবীর আগুনের তুলনায় নরকাগ্নি বেশি উষ্ণতর। এই মহাপৃথিবী জলে প্রতিষ্ঠিত, জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত এবং বায়ু আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এই বর্গে নির্বাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে নিরোধই নির্বাণ। সবাই নির্বাণ লাভ করতে পারে না। কেবল যারা লোভ, দ্বেষ, মোহ, ত্যাগ করে সকল অবিদ্যা দূর করতে পারে, তারাই নির্বাণ লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করে সেই শুধু নির্বাণের সুখ অনুভব ও দর্শন করতে পারে।

দ্বিতীয় বর্গ

দ্বিতীয় বর্গে বুদ্ধের অস্তিত্ব, বুদ্ধ অনুত্তর, বুদ্ধের অনুত্তরত্ব সম্বন্ধে জানা, ধর্ম দর্শন, সংক্রমণ বিনা প্রতিসন্ধি, জ্ঞাতার উপলব্ধি, অন্য দেহে সংক্রমন, কর্ম ও কর্ম ফলের অস্তিত্ব, জন্মগ্রহণকারীর জ্ঞান ও বুদ্ধের বিদ্যমানতা নিয়ে কথোপকথন হয়েছে।[৪] যদিও আমরা কেউ বুদ্ধকে দেখিনি তারপরও তিনি ছিলেন। ভগবান বুদ্ধ অনুত্তর (শ্রেষ্ঠতম) ছিলেন। যিনি বুদ্ধের ধর্মকে দেখেন, তিনি বুদ্ধের অনুত্তর সম্পর্কে জানতে পারেন। বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে তাঁর শিক্ষাপ্রণালী শ্রাবকদের সারা জীবন আচরণ করাই হলো ধর্ম দর্শন। জগতে সংক্রমন ছাড়া পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু

এমন কোন সংক্রমন নাই যা এক দেহ থেকে অন্য দেহে যেতে পারে। পৃথিবীতে যে জন্মগ্রহণ করে, সে জানতে পারে সে জন্মগ্রহণ করবে। বুদ্ধের বিদ্যমানতা সম্পর্কে মিলিন্দরাজ প্রশ্ন করলে আয়ুষ্মান নাগসেন বলেন- ভগবান অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছেন। তাই বুদ্ধকে এখানে সেখানে প্রদর্শন করা যায় না।

তৃতীয় বর্গ

'বিমতিচ্ছেদন প্রশ্নের' তৃতীয় বর্গে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তা হলো: প্রব্রজিতের কায়প্রীতি, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী, বুদ্ধের মহাপুরুষ লক্ষণ, ভগবানের ব্রহ্মচর্য, বুদ্ধের উপসম্পদা, শোকাশ্রু ও প্রেমাশ্রু, সরাগ-বীতরাগের মধ্যে ভেদ, প্রজ্ঞার স্থান, সংসার, পূর্বকৃতি স্মরণ ও অভিজ্ঞতাজনিত স্মৃতি। প্রব্রজিতদের কায় প্রীতি থাকে না। বুদ্ধ ছিলেন সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত, অশীতি অনুব্যঞ্জন শোভিত, সুবর্ণ বর্ণের দেহধারী, কাঞ্চন সদৃশ চর্ম বিশিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর শরীর হতে ব্যাম পরিমাণ চতুর্দিকে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ত। বুদ্ধ ব্রহ্মচারী ছিলেন কিন্তু ব্রহ্মা ভগবানের শিষ্য। বুদ্ধের উপসম্পদার দরকার হয়নি, তিনি স্বয়ং সম্বুদ্ধ হন। প্রজ্ঞার কোন স্থান নেই। সংসার বলতে প্রাণী যেখানে জন্মগ্রহণ করে, লালিত পালিত হয়, সেখানে মৃত্যুবরণ করে এবং পুনরায় অন্য লোকে উৎপন্ন হয়। স্মৃতির দ্বারা আমরা পূর্বকৃতি স্মরণ করতে পারি। স্মৃতি অভিজ্ঞা ও কৌশল হতে উৎপন্ন হয়।

চতুর্থ বর্গ

চতুর্থ বর্গে স্মৃতির উৎপত্তি, পাপ-পুণ্যের অল্পাধিক্য, কৃতপাপের ভেদ, শ্বাস-প্রশ্বাসের নিরোধ, সমুদ্রের এক রস, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জীব, প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তদশ প্রকারে স্মৃতি উৎপত্তি হয়। যথা: অভিজ্ঞা, কৌশল, স্থুল বিজ্ঞান, হিত বিজ্ঞান, অহিত বিজ্ঞান, সদৃশ নিমিত্ত, বিসদৃশ নিমিত্ত, কথাভিজ্ঞা, লক্ষণ, স্মরণ করানো, মুদ্রা গণনা, ধারণ, ভাবনা, গ্রন্থ-নিবন্ধন, উপনিক্ষেপ (নিকটে স্থাপন) এবং অনুভূতি। ব্রহ্মলোকের দূরত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে- যদি কূটাগার পরিমাণ শিলা ব্রহ্মলোক হতে পতিত হয়, তবে তা একদিন এবং এক রাতে আটচল্লিশ শত সহস্র যোজন চলে চার মাসে পৃথিবীতে এসে পৌঁছাবে। আর বশীভূত চিত্ত ঋদ্ধিমান ভিক্ষু জম্বুদ্বীপে অন্তর্হিত হয়ে ব্রহ্মলোকে পৌঁছাতে পারে আরো দ্রুত। একই সাথে দুই ব্যক্তি কালগত হলে একই সাথে উৎপন্ন হবে। বোধ্যঙ্গ সাত প্রকার। একমাত্র ধর্মবিচয় বোধ্যঙ্গ দিয়ে বোধোদয় হয়। কিন্তু এর জন্য অন্য ছয়টি বোধ্যঙ্গের প্রয়োজন হয়। পাপ-পুণ্যের মধ্যে পুণ্য অধিক শক্তিশালী আর পাপ কম জেনে শুনে যে পাপ করে তার পাপ অধিক হয়। মহামানব গৌতম বুদ্ধ জীবনে যে দুষ্কর কাজ করেছে তা হলো: একই আলম্বনে বর্তমান অরূপী (চেতন) চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম (মন ও মনোবৃত্তি) নিশ্চয়ের বিশ্লেষণ দিয়ে তিনি বলেছেন- "ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা, ইহা চেতনা এবং ইহা চিত্ত।" এটি ছিল ভগবান বুদ্ধের একটি দুষ্কর কর্ম।

পঞ্চম বর্গ

পঞ্চম বর্গে নাগসেনের কাছে রাজা মিলিন্দের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মিলিন্দরাজ এই বর্গে বলেন, অদ্য হতে প্রতিদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আটশত জনের খাদ্যভোজ পাবেন তাঁর কাছ থেকে। এই বর্গে রাজা মিলিন্দ ও আয়ুষ্মান নাগসেনের মনের কথাও প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চম বর্গের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে 'বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন' অধ্যায়ের।

● লক্ষণ-প্রশ্ন

লক্ষণ প্রশ্ন হলো "মিলিন্দ প্রশ্ন" গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ে চারটি বর্গ রয়েছে। যথা: (ক) প্রথম বর্গ, (খ) দ্বিতীয় বর্গ, (গ) তৃতীয় বর্গ (ঘ) চতুর্থ বর্গ। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

প্রথম বর্গ

প্রথম বর্গে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তা হলো- প্রজ্ঞপ্তি প্রশ্ন, বর্ষ গণনা প্রশ্ন, মীমাংসা প্রশ্ন, অনন্তকায় প্রশ্ন, প্রব্রজ্যা প্রশ্ন, প্রতিসন্ধি প্রশ্ন, যোনিশ মনস্কার প্রশ্ন, মনস্কার লক্ষণ প্রশ্ন, কুশল ধর্ম প্রশ্ন, শীলের লক্ষণ, শ্রদ্ধার লক্ষণ, বীর্যের লক্ষণ, স্মৃতির লক্ষণ, সমাধির লক্ষণ, প্রজ্ঞার লক্ষণ। এই বর্গে রাজা মিলিন্দ ও আয়ুষ্মান নাগসেনের প্রাথমিক পরিচয়সহ বৌদ্ধদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন-উত্তরে কথোপকথন হয়েছে। 'প্রজ্ঞপ্তি প্রশ্নে' নাগসেন বলেন, ব্যক্তির পরিচয়ের জন্য 'নাগসেন', 'শূরসেন', 'বীরসেন', কিংবা 'সিংহসেন' কেবল ব্যবহার করবার নিমিত্ত আখ্যা, সংজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি ও নামমাত্র; কেননা এতে কোন পুদ্গলের (আত্মার) উপলব্ধি হয় না। 'মিমাংসা প্রশ্নে' রাজা মিলিন্দ আয়ুষ্মান নাগসেনের সাথে তর্কালাপ করার জন্য অনুমতি চান। প্রব্রজ্যা প্রশ্নে প্রব্রজ্যার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান দুঃখ নিরুদ্ধ করা এবং পরিনির্বাণ লাভ করাই প্রব্রজ্যার পরমার্থ বা চরম লক্ষ্য। 'প্রতিসন্ধি-প্রশ্ন' ও 'যোনিশ মনস্কার প্রশ্নের' উত্তরে নাগসেন বলেছেন- যার ক্লেশ (তৃষ্ণা-অবিদ্যাদি) আছে সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, আর যিনি ক্লেশ-মুক্ত, তিনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না।[৫] যোনিশ (যথাযথ) মনস্কার হেতু কেউ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না। মনস্কারের লক্ষণ বিবেচনা, আর প্রজ্ঞার লক্ষণ ছেদন, সমস্ত কুশল ধর্মের প্রতিষ্ঠাই শীলের লক্ষণ। চিত্তের প্রসন্নতা সাধন ও উৎসাহ উৎপাদন শ্রদ্ধার লক্ষণ। উপস্তম্ভণ বা দৃঢ়ীকরণ বীর্যের লক্ষণ। যথার্থ স্মরণ ও উপগ্রহণ স্মৃতির লক্ষণ। চিত্তের একাগ্রতা সাধনই সমাধির লক্ষণ। ছেদন ও প্রকাশন হলো প্রজ্ঞার লক্ষণ। আর এই সমস্ত কুশল ধর্ম এক হয়ে সমস্ত ক্লেশরাশি নষ্ট করে যোগীকে নির্বাণ গামী করেন।

দ্বিতীয় বর্গ

লক্ষণ প্রশ্নের দ্বিতীয় বর্গে আলোচনা করা হয়েছে ধর্ম সন্ততি, পুনর্জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বরূপ, অর্হতের সুখ-দুঃখ অনুভূতি, বেদনা, নাগসেনের পুনর্জন্ম, নাম ও রূপ পরস্পর আশ্রিত, কালের বিষয়। একটি রূপকে আশ্রয় করে ধর্ম সন্ততি (অস্তিত্বের ধারা) প্রবাহিত হয়। একটি অবস্থা উৎপন্ন হয়, অন্যটি বিনষ্ট হয়। অপূর্বাপরের

মতো (যেন এক সঙ্গে) এই প্রবাহ চলতেই থাকে। যে জন্মগ্রহণ করে সে- সেও নয়, আবার অন্যও নয়। পূর্ব জন্মের অন্তিম বিজ্ঞানের (চ্যুতি চিত্তের) লয় হওয়ার সাথে সাথেই পরবর্তী জন্মের প্রথম বিজ্ঞান (প্রতিসন্ধি চিত্ত) উদয় হয়, সম্মিলিত হয়। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে কৃষক যেমন জানতে পারে বীজ বপন না করলে সে আর ফসল পাবে না, তেমনি অর্হৎ জানতে পারে সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে কি না। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা একই বস্তু। যারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না তারা কেবল শারীরিক বেদনা অনুভব করেন, কিন্তু মানসিক বেদনা অনুভব করেন না। বেদনা তিন প্রকার। যথা সুখ-বেদনা কুশল (পুণ্য), অকুশল (পাপ) আর অব্যাকৃত (অপাপ-অপুণ্য) বেদনা। নাম-রূপের আশ্রয়ে মানুষ পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। যে পুণ্য কর্ম করে তার নামরূপ ধ্বংস হয় আর যে নামরূপ অকুশল কর্ম করে সে বারবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। নাম ও রূপ পরস্পর আশ্রিত।

তৃতীয় বর্গ

কালের মূল, কালের পূর্বসীমা, পূর্ব সীমার সন্ধান, সংস্কারের উৎপত্তি ও নিরোধ, ভাব হতে ভাবের উৎপত্তি, কোন জ্ঞাতা বা আত্মা নাই, চক্ষু বিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ, বেদনার লক্ষণ, সংজ্ঞার লক্ষণ, চেতনার লক্ষণ, বিজ্ঞানের লক্ষণ, বিতর্কের লক্ষণ ও বিচারের লক্ষণ নিয়ে এই বর্গে কথোপকথন হয়েছে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে কাল বলে। কালের মূল হলো অবিদ্যা। অবিদ্যা-প্রত্যয় হতে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয় হতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয় হতে নাম-রূপ, নাম-রূপ প্রত্যয় হতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-প্রত্যয় হতে উপাদান, উপাদান-প্রত্যয় হতে ভব, ভব প্রত্যয় হতে জন্ম, এবং জন্ম-প্রত্যয় হতে জরা-মরণ-শোক-পরিবেদন-দুঃখ-দুশ্চিন্তা-হতাশা উৎপন্ন হয়। কালের পূর্ব সীমা জানা যায় না। ভাব হতে ভাবের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ সকল অবিদ্যা থেকে দুঃখ উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধ দর্শন আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না। কেননা আমরা নাম-রূপ দিয়ে সবই দেখি, শুনি, অনুভব করি। চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তির মনোবিজ্ঞানের উৎপন্ন হয়। আয়ুষ্মান নাগসেন আরো বলেছেন- স্পর্শ করা স্পর্শের লক্ষণ, অনুভূতি ও সংবেদন বেদনার লক্ষণ, সংজানন বা উপলব্ধি সংজ্ঞার লক্ষণ, চিন্তা করা এবং মানসিক কর্ম প্রস্তুত করাই চেতনার লক্ষণ, বিশেষরূপে জানা বিজ্ঞানের লক্ষণ, কোন এক বস্তুর উপর চিন্তাকে নিবদ্ধ রাখাই বিতর্কের লক্ষণ, অনুমার্জন বা আঘাত করাই বিচারের লক্ষণ।

চতুর্থ বর্গ

স্পর্শাদি ধর্মসমূহ- স্পর্শ, চেতনা, বিজ্ঞান, বিতর্ক ও বিচার প্রভৃতি পৃথক রূপে দেখা যায় না। যেমন- রাজার পাচক যদি রস প্রস্তুত করার সময় সেখানে দধি, লবণ, আদা, জিরা, মরিচ প্রভৃতি অনেক জিনিস প্রদান করে রস তৈরি করে। কিন্তু পরবর্তীতে তা রসের মধ্যে পৃথক করে দেখাতে পারে না। তেমনি স্পর্শাদি আলাদা করে দেখানো সম্ভব নয়। অথচ সমস্ত চেতন ধর্ম নিজ নিজ লক্ষণ অনুসারে বিদ্যমান থাকে।

● মেণ্ডক প্রশ্ন

'মেণ্ডক প্রশ্ন' হলো মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থের চতুর্থ বিভাগ। এতে আটটি বর্গ রয়েছে। মেণ্ডক অর্থ দ্বৈত। রাজা মিলিন্দের ভগবান বুদ্ধের বাণীর কোন বিষয় পর্যায়ক্রমে দেশিত হয়েছে, কোথাও যথাসম্পর্ক অনুসারে দেশিত হয়েছে এবং কোথাও স্বভাব অনুসারে ভাষিত হয়েছে; এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সন্দিহান ও দ্বৈত প্রশ্ন খুঁজে পান। যা মিলিন্দ প্রশ্নে মেণ্ডক প্রশ্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে আটটি বর্গ রয়েছে। যথা: প্রথম বর্গ, দ্বিতীয় বর্গ, তৃতীয় বর্গ, চতুর্থ বর্গ, পঞ্চম বর্গ, ষষ্ঠ বর্গ, সপ্তম বর্গ, অষ্টম বর্গ।

প্রথম বর্গ

মেন্ডক প্রশ্নের প্রথম বর্গে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তা হলো: মন্ত্রণার অযোগ্য স্থান, মন্ত্রণার বিনাশকারী, গুপ্ত বিষয় প্রকাশকারী, বুদ্ধি বৃদ্ধির উপায়, শিষ্যের প্রতি আচার্যের কর্তব্য, উপাসকের গুণ, বুদ্ধ পূজা সফল, বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা, দেবদত্তের প্রব্রজ্যা, ভূমিকম্পের কারণ, শিবিরাজের চক্ষুদান, চীন রাজার সত্যবল, বিন্দুমতীর সত্যবল, গর্ভসঞ্চার, সদ্ধর্মের অন্তর্ধান, সর্বজ্ঞ বুদ্ধ অকুশলমুক্ত, তথাগতগণের উত্তরকরণীয়, ঋদ্ধিবল প্রদর্শন।

মন্ত্রণার অযোগ্য স্থান বলতে আটটি স্থানকে বোঝানো হয়েছে। (১) বিষম স্থান, (২) সভয়স্থান, (৩) অতিবাতস্থান, (৪) প্রতিচ্ছন্নস্থান, (৫) দেবস্থান, (৬) চলাচলের পথ, (৭) সেতু (পাঠান্তরে সংগ্রাম ক্ষেত্র) ও (৮) জলের ঘাট এই আট স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।[৬]

আট প্রকার লোকের সাথে মন্ত্রণা করলে মন্ত্রণার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। যথা: (১) রাগচরিত, (২) দ্বেষচরিত, (৩) মোহ চরিত, (৪) মানচরিত, (৫) লোভী, (৬) অলস, (৭) এক চিন্তাকারী ও (৮) মূর্খ।

আচার্যগণের পঞ্চবিংশতি গুণ দিয়ে শিষ্যের প্রতি আচার্যের কর্তব্য পালন করতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম হলো: সব সময় শান্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণের যত্ন নিতে হবে, প্রমত্ত-অপ্রমত্ত সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে, সকল শিষ্যের প্রতি সমান দায়িত্ব পালন ও শিক্ষাদান করতে হবে প্রভৃতি। প্রথম বর্গের অন্যতম বিষয় হলো বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা ও বুদ্ধ পূজা। মহামানব গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সর্বজ্ঞ। সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল মহাপরাক্রমশালী। তিনি এই জগত থেকে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন। দেব ও মানব তাঁর উদ্দেশ্যে যে পূজা করেন তা তিনি গ্রহণ করেন না। কিন্তু এই পূজা অবন্ধ্যা ও সফল হয়। কেননা পূজার মধ্য দিয়ে দেবকূল ও মনুষ্যকূল নিজেদের পাপ থেকে দূরে রেখে পুন্য অর্জন করেন। পৃথিবীতে আটটি কারণে ভূমিকম্প হয় তবুও রাজা বেস্সন্তর যখন মহাদান দেন, তখন মহাপৃথিবী সাতবার কম্পিত হয়েছিল।[৭] যা ছিল অসাময়িক। কদাচিৎ ঘটনা এবং আট কারণের বহির্ভূত। শিবিরাজের চক্ষুদানে পাওয়া যায় শিবিরাজ সত্য বলে দিব্যচক্ষু লাভ করেছিলেন। এই বর্গে গর্ভ সঞ্চার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিন বস্তুর সংযোগ হলে গর্ভের সঞ্চার হয়। যথা: (১) মাতা-পিতার মিলন হওয়া, (২) মাতা ঋতুমতী হওয়া এবং (৩) গন্ধর্বের (জন্ম অন্বেষণকারী সত্ত্ব) উপস্থিত থাকা। এই তিনটির

সম্মিলন হলে গর্ভের সঞ্চার হয়ে থাকে। এছাড়াও এ বর্গে বুদ্ধের অকুশলমুক্ত ও সর্বজ্ঞতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বর্গ

'মেন্ডক প্রশ্নের' দ্বিতীয় বর্গে আলোচনা করা হয়েছে- ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ সমূহ, অবর্ণনীয় প্রশ্ন, মৃত্যু-ভয়, মৃত্যু পাশ মুক্তি ও পরিত্রাণ, বুদ্ধের লাভান্তরায়, জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপ, ভিক্ষুসঙ্গ পরিচালন ও অভেদ্য পরিষদ। 'দুক্কট আপত্তি' (বিনয় পরিভাষা, দুস্কত) ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ আর 'দুর্ভাষিত আপত্তি' অনুশিক্ষাপদ। এই দুই জাতীয় আপত্তিগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ। মৃত্যু-ভয় সম্পর্কে 'মিলিন্দ প্রশ্নে' বলা হয়েছে পৃথিবীতে সকল প্রাণী মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু একমাত্র অর্হৎ সর্ববিধ ভয় অতিক্রম করেছে। যারা চার আর্যসত্য দর্শন করেনি, যারা লোভ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ করে অবিদ্যা দূর করেনি, কেবল তারাই মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু অর্হৎ ভয়কে জয় করে।[৮] পৃথিবীতে সকল প্রাণীকে জন্ম গ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতে হবে মৃত্যু-পাশ-মুক্তি ও মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ নেই। ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা অর্থে যে সমস্ত বিষয় ফুটে উঠেছে তা হলো তথাগত পরিষদের অনুগামী হন না, কিন্তু পরিষদ তাঁর অনুগামী হয়। আর 'আমি' ও 'আমার' এগুলো ব্যবহারিক সত্য; পরমার্থ সত্য নয়। তথাগতের প্রেম বন্ধন (আসক্তি) বিগত, স্নেহ মমতা (মায়া) বিগত, এগুলো আমার বলে কোন মমতা, আকর্ষণ নাই। কিন্তু বুদ্ধ আশ্রিতের আশ্রয় হয়ে থাকেন। পৃথিবী যেমন ভূমিস্থিত জীবগণের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা হয়, সকল জীব পৃথিবীকে আশ্রয় করে থাকে, অথচ মহাপৃথিবীর এমন কোন অপেক্ষা থাকে না যে 'এগুলো আমার'। তেমনি বুদ্ধ সকল প্রাণীর আঁধার হন, সমস্ত জীবকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে কখনও এই অপেক্ষা থাকে না যে 'এরা আমারই'। ভিক্ষু সংঘ হচ্ছে অভেদ্য পরিষদ। দেবদত্ত পাঁচশত বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ ভিক্ষুসংঘ ত্যাগ করলেও ভিক্ষুসংঘ ভেদ করতে পারে নি।

তৃতীয় বর্গ

তৃতীয় বর্গে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সর্বসত্ত্বের হিত সাধন, বস্ত্র-গুহ্য প্রদর্শন, বুদ্ধের কর্কশ বাণী, বৃক্ষ অচেতন, মহা ফলপ্রদ পিন্ড, বুদ্ধপূজা ভিক্ষুদের নিমিত্ত নয়, বুদ্ধপাদ শিলাখন্ডাহত, শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ শ্রমণ, গুণ প্রকাশন, অহিংসা ও নিগ্রহ, ভিক্ষু বহিষ্করণ বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ ধর্মে বলা হয়েছে জনগণের মধ্যে ধর্মই শ্রেষ্ঠতম হয়: আর এটাও ঠিক যে, গৃহী উপাসক স্রোতাপন্ন হলেও কোন সাধারণ ভিক্ষুকে প্রণাম ও গোত্রোত্থান করে সম্বর্ধনা করতে হবে। কারণ শ্রমণের বিংশতি প্রকার শ্রমণকর গুণ ও দুই প্রকার বাহ্যিক চিহ্ন থাকে, যার দ্বারা শ্রমণগণ প্রণাম, প্রত্যুত্থান, সম্মান ও পূজার যোগ্য হন। যেমন- শ্রমণগণ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ শিক্ষাসহ সকল প্রকার পাপ ও কলুষ চিন্তা ত্যাগ করে ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করেন। মহামানব গৌতম বুদ্ধ সর্ব সত্ত্বের হিত সাধন করেন। তিনি কখনো কোন প্রাণীকে কষ্ট দেন নি। কিন্তু তাঁর ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে কতিপয় মিথ্যাপথগামী ভিক্ষুগণের হৃদয়ে দাহ উৎপন্ন হয়। যার ফলে তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়। বুদ্ধের ভাষা ছিল মিষ্ট। তিনি কখনো

কোন দিন কারো সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলেন নি। কিন্তু সুদিন্নকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। তিনি যখন সুদিন্নকে ভর্ৎসনা করেছেন, তখন তা বিদ্বেষ চিত্তে করেন নি।

বুদ্ধের অন্তিম ভোজন সম্পর্কে 'মিলিন্দ প্রশ্নে' রাজা মিলিন্দ উভয় কোটিক প্রশ্ন করেন। উত্তরে আয়ুষ্মান নাগসেন বলেন- চুন্দের প্রদত্ত খাদ্য ভোজন বুদ্ধের অন্তিম ভোজন হওয়ায় দেবগণ আনন্দিত ও প্রসন্নিত হয়ে বহুগুণ সম্পন্ন দিব্য ওজ 'শূকর-মদ্দবে' নিক্ষেপ করেছেন। তাতে উত্তম পক্ক, লঘুপাক, সুস্বাদু, রসযুক্ত ও জঠরাগ্নির হিতকর হয়েছিল। তাই বলা হয়, এই দান ছিল মহাদান, এছাড়াও এই বর্গে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। যার মধ্যে অন্যতম ছিল ভিক্ষু বহিষ্করণ প্রসঙ্গ। বুদ্ধ স্থবির সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে ক্রোধান্বিত হয়ে বহিস্কৃত করেন নি বরং তারা নিজেদের কৃতকর্মের অপরাধের জন্য বহিস্কৃত হয়েছেন।

চতুর্থ বর্গ:

'মেন্ডক প্রশ্ন' এর চতুর্থ বর্গে ঋদ্ধি ও কর্ম বিপাক, ধর্ম বিনয় আচ্ছন্ন-অনাচ্ছন্ন, মিথ্যা বাক্যের গুরুত্ব-লঘুত্ব, বোধি সত্ত্বের ধর্মতা, আত্মহত্যার বিষয়, মৈত্রী-ভাবনার ফল, পাপ-পুণ্যের বৈষম্য, অমরাদেবীর বিষয়, অর্হত্বের অভয়, বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঋদ্ধি ও কর্ম-বিপাক সংক্রান্ত প্রশ্ন। ঋদ্ধিমান ভিক্ষুশ্রাবকদের মধ্যে মহামৌদ্গল্যায়ন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তারপরও তিনি দন্ডাহত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন। এর কারণ হচ্ছে জগতে কর্ম-ফলই সবচেয়ে অধিক বলশালী। কর্ম-ফল সকলকে দমন করে নিজের প্রভাবে পরিচালিত করে। কর্মফলের কারণে ঋদ্ধিমান পুরুষ হওয়া স্বত্ত্বেও মহামৌদ্গল্যায়নকে মহাপরিনির্বাণ লাভ করতে হয়।

মহামানব বুদ্ধের আবিস্কৃত ধর্ম ও বিনয় অনাবৃত উজ্জ্বল হয়, আবৃত নয়। পাতিমোক্ষ উপদেশ এবং সমগ্র বিনয় পিটক গোপনে রক্ষা করতে হয়। তিনটি কারণে ভগবান সীমা নির্দিষ্ট করে, প্রাতিমোক্ষের উদ্দেশ্য গোপন রাখার অনুমতি দিয়েছেন। যথা-

(১) পূর্ব বুদ্ধগণের বংশ-রীতি অনুসারে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ্য এ রকম সীমা নির্দিষ্ট করে অবরুদ্ধ ছিল;

(২) ধর্মের গৌরববশত: এবং

(৩) ভিক্ষুপদের গৌরববশত: অবরুদ্ধ হয়েছে।

দুই মানুষের প্রভেদের কারণে মিথ্যা বাক্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করা হয়। বোধিসত্ত্বের ধর্মতায় বলা হয়েছে- বোধিসত্ত্বের পিতা-মাতা, কুল, স্থান, আয়ু, সময়, মাস ও গৃহ ত্যাগের বিষয় আগেই দেখে থাকে অর্থাৎ জন্মের পূর্বেই তা নির্ধারণ হয়। মৈত্রী ভাবনার ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে চিত্ত-বিমুক্তিরূপ মৈত্রীর অনুশীলন করলে, ভাবনা করলে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করলে, বিস্তার করলে, আধার করলে, অনুষ্ঠান করলে, উত্তমরূপে শিক্ষা করলে ও তাতে সোৎসাহে আত্মনিয়োগ করলে একাদশ বিধ ফল লাভ করা যায়।[৯] যথা:

(১) সুখে নিদ্রিত হয়, (২) সুখে জাগ্রত হয়, (৩) দুঃস্বপ্ন দেখে না, (৪) মানুষদের প্রিয় হয়, (৫) অমানুষদের প্রিয় হয়, (৬) দেবতারা তাকে রক্ষা করেন, (৭) অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাঁর কোন অনিষ্ট করে না, (৮) সহসা তাঁর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, (৯) তার মুখের চেহারা সবসময় সুপ্রসন্ন থাকে, (১০) মূচ্ছিত না হয়ে তাঁর দেহত্যাগ হয়, (১১) অর্হৎপদ লাভ করতে না পারলেও তিনি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পাপ-পুণ্যের বৈষম্য বিষয়ে দেবদত্ত ও বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী অর্থাৎ জাতকের কথা ফুটে ওঠে। দেবদত্ত নিজ পুণ্যে বহু মানুষের হিত সাধন হেতু বরাবরই বোধিসত্ত্বের চেয়ে উঁচু কুল, যশ, ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু জন্ম জন্মান্তর বোধিসত্ত্বের সাথে অন্যায় ও পাপ কর্ম করার জন্য যক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে পাপী যক্ষ হয়ে অনেককে অধর্ম পথে পরিচালিত করার জন্য সাতান্ন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর নরকে মহাদুঃখ ভোগ করতে হয়। আর বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। পাপের ফলে দেবদত্ত পাতালের নরকে প্রবেশ করেন আর পুণ্যের ফলে বোধিসত্ত্ব মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। এছাড়াও এই বর্গে অমরাদেবী সতি-সাবিত্রী স্ত্রী ছিলেন, অর্হৎদের অভয় এবং বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম বর্গ

পঞ্চম বর্গে যে সমস্ত বিষয়ে কথোপকথন হয়েছে তা হলো: গৃহবাস প্রশ্ন, ভোজনে সংযম, বুদ্ধের নীরোগত, মার্গোৎপাদন, বুদ্ধের অহিংসক, ছদ্দন্ত জ্যোতিপাল সম্বন্ধে, ঘটিকার প্রশ্ন, ব্রাহ্মণ রাজবাদ, গাঁথা উচ্চারিত ভোজন অনুচিত, ভগবানের খাদ্যে দিব্য ওজ:, ধর্মোপদেশে নিরুৎসাহ।[১০] বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য অরণ্যে ধ্যান ও বাস অত্যন্ত পুণ্যের কাজ কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য বিহারেরও গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা বিহার দান করে সাধারণ মানুষ পুণ্য লাভ করে আর বিহারে বিদ্যমান ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের দেখে মানুষ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। ভোজনের বিষয়ে বুদ্ধ বলেছেন "জাগ্রত হও, প্রমত্ত হইও না। ভোজনে সংযম রক্ষা কর।" ভোজনে অসংযমের কারণে দেবদত্ত সংঘভেদ করে এককল্প স্থায়ী পাপ কর্ম সঞ্চয় করে। ভগবান বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে বাকুল সর্বাপেক্ষা নিরোগ ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে যত জীব আছে- পদহীন, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ, রূপবিশিষ্ট, রূপহীন, সংজ্ঞাবান, সংজ্ঞারহিত এবং সংজ্ঞাবান ও সংজ্ঞারহিত নয়, তাদের সকলের মধ্যে সম্যক সম্বুদ্ধই অগ্রগণ্য হন। তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক। পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের পরিনির্বাণ হলে, অনুশাসকের অভাব হলে, মার্গেরও অন্তর্ধান হয়। সেই অন্তর্হিত সনাতন মার্গকে নিজের প্রজ্ঞা চক্ষু দ্বারা অনুসন্ধান করে বুদ্ধ দেখেছেন। সেই কারণে বুদ্ধ বলেছেন, "ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক।"

বুদ্ধ ছিলেন অহিংসক। কিন্তু তিনি পূর্ব জন্মে 'লোমশ-কাশ্যপ ঋষি' কর্তৃক অনেক শত প্রাণীকে হত্যা করে বাজপেয় মহাযজ্ঞ সম্পাদিত করান। কিন্তু তিনি এই কাজ রাগবশত: অসতর্ক অবস্থায় করেন। তিনি রাজকুমারী চন্দ্রাবর্তীর রূপ দর্শনে ক্ষিপ্ত চিত্তের হয়ে এই পাপকর্ম করেন। কিন্তু তিনি সজ্ঞানে ছিলেন নিষ্পাপ। ঘটিকার প্রশ্নে বুদ্ধের অ-লোভের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তিনি ইচ্ছা করলেই ঋদ্ধিবলে নিজের কুটিরকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা

করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কোন অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করেন নি। বুদ্ধ ছিলেন ব্রাহ্মণ ও রাজা। কেননা তিনি সকল পাপ, দ্বেষ, মোহ ধ্বংস করে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ বলতে জাতিকে বোঝানো হয় নি আবার রাজা বলতে রাজ কাজ পরিচালনা করেন এমন বোঝানো হয়নি। সকল পাপের ঊর্ধ্বে ছিলেন, তাই তিনি ব্রাহ্মণ আর সমগ্র লোককে দেশনা দিয়ে শাসন করতেন বলে তিনি জগতের রাজা। বুদ্ধের ধর্মোপদেশক নিরুৎসাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বুদ্ধ চার অসংখ্য লক্ষ কল্পকাল হতে সংসারের জনগণের উদ্ধারের জন্য ধীরে ধীরে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান পূর্ণ করেন। কিন্তু সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তির পর তিনি ধর্ম দেশনায় নিরুৎসাহ হন। এই ইচ্ছার কারণ ছিল যে, প্রথমত: তিনি ধর্মের গভীরতা, নিপুণতা, দুজ্ঞেয়তা, সূক্ষ্মতা ও দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করেন। দ্বিতীয়ত: সংসারের জনগণ ভোগ-বাসনায় লিপ্ত রয়েছে এবং সৎকায় দৃষ্টিতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রয়েছে। এটা দেখে বুদ্ধ ভাবলেন 'কি করি? কি ভাবে করি? এই চিন্তাতেই তাঁর চিত্ত নিরুৎসাহে নমিত হয়, ধর্মদেশনায় নয়। জনগণের বোধ শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করেই তিনি এমন করেছেন। সকল বুদ্ধের এই রীতি যে, তাঁরা ব্রহ্ম কর্তৃক প্রার্থিত হবার পর ধর্ম দেশনা করেন। এর কারণ এই যে, সেই সময় সমস্ত লোক এমনকি তপস্বী, পরিব্রাজক, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মার উপাসক ছিলেন, ব্রহ্মাকেই গৌরব করতেন এবং ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। সেই কারণে যদি সেই বলবান, যশস্বী, বিখ্যাত, জ্ঞানী, লোকোত্তর ও সর্বাগ্রগণ্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রণত হন, তাহলে দেবতাদের সাথে সমগ্র লোক অবনত হবে, ধর্মকে মান্য করবে, আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করবে। এই কারণে বুদ্ধরা ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে ধর্মদেশনা করেন।

ষষ্ঠ বর্গ

এই বর্গে আলোচনা করা হয়েছে বুদ্ধের আচার্য নাই, এক সঙ্গে দুই বুদ্ধের অনুৎপত্তি, গৌতমীর বস্ত্রদান, গৃহী ও ভিক্ষুর সদাচার, প্রতিপদা বা চর্যার দোষ, হীনতার আবর্তন, অর্হৎদের বেদনার অনুভূতি, ধর্ম-জ্ঞান লাভের অন্তরায়, দু:শীলতার পার্থক্য, জলে প্রাণ আছে কি। মহামানব গৌতম বুদ্ধের কোন আচার্য নাই। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাপরাক্রমশালী। আচার্যবিহীন স্বয়ম্ভূজ্ঞানে তিনি বুদ্ধ হয়েছেন। সেই কারণে বুদ্ধ বলেছেন:

"আমার আচার্য নাই, নাই কেহ আমার সমান,
দেব-নর-লোকে কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বিদ্যমান।"

এই দশ সহস্র সংখ্যক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক সময়ে এক বুদ্ধকে ধারণ করতে পারে। একজন মাত্র বুদ্ধের গুণ ধারণ করতে পারে। যদি দুই জন বুদ্ধ এক সঙ্গে উৎপন্ন হন, তবে এই বিশ্ব তা ধারণ করতে পারে না। তখন বিশ্ব চঞ্চল হয়, কম্পিত হয়, নমিত হয়, অবনত হয়, বিনীত, বিক্ষিপ্ত ও বিধ্বংস হয়; যথাস্থানে স্থির থাকে না। গৃহী ও ভিক্ষুর সদাচারে ভগবান বলেছেন "ভিক্ষুগণ! আমি গৃহীদের কিংবা ভিক্ষুদের সম্যক আচরণের প্রশংসা করি। সদাচারে নিরত গৃহী কিংবা ভিক্ষু তাদের সদাচরণের দরুণ ন্যায়, ধর্ম ও পুণ্যের আরাধক হতে পারে।" যে ব্যক্তি সদাচারে নিরত সে-ই শ্রেষ্ঠ। তবে প্রব্রজ্যার বহু গুণ, অপ্রমেয় গুণ। প্রব্রজ্যার গুণ পরিমাণ করা সম্ভব নয়। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে তপস্যা করেছিলেন তা ছিল মধ্যমপন্থা। তিনি কঠোর কৃচ্ছ সাধন করে দেখেন অর্থাৎ আহার বন্ধ

করে দুর্বল হয়ে যান। তাই মার্গ লাভের জন্য তিনি আহার ভোজন করে ধীরে ধীরে সুখ হয়ে সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। জগতে যারা অর্হৎ প্রাপ্ত হন তাঁরা কেবল শারীরিক বেদনা অনুভব করেন, মানসিক বেদনা তাদের স্পর্শও করতে পারে না। কারণ দেহের উপর অর্হৎদের কোন অধিকার ও স্বাধীনতা থাকে না। গৃহী জীবনে লোকোত্তর মার্গফল লাভের অন্তরায় হলো পারাজিকা পাপ। যদি কোন গৃহী জেনে বা না জেনে পারাজিকা পাপ করে তবে সে কোন দিনও মার্গফল লাভ করতে পারবে না। কোন বীজ কঠিন পার্বত্য পাষাণ-ফলকে বপন করলে যেমন অঙ্কুরিত হবে না তেমনি পারাজিক প্রাপ্ত গৃহী কখনো মার্গফল লাভ করতে পারবে না। এই বর্গে দুঃশীলতার পার্থক্যে বলা হয়েছে একজন গৃহী দুঃশীল (দুরাচারী) থেকে ভিক্ষু দুঃশীলের দশগুণ অধিকতর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়। ভিক্ষু দশবিধ কারণে নিজের প্রাপ্ত দক্ষিণা (দান) বিশুদ্ধ করেন। ভিক্ষু দুঃশীল হলেও (১) বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, (২) ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, (৩) সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, (৪) সতীর্থগণের প্রতি বিশ্বাস রাখেন, (৫) ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়নশীল ও গবেষণায় উদ্যোগী হন, (৬) ধর্ম শ্রবণে বহু আগ্রহান্বিত হন, (৭) শীলভ্রষ্ট হলেও দুঃশীল অবস্থায় সভায় গমন করলে তিনি শিষ্ঠ ব্যবহার করেন, (৮) পরনিন্দার ভয়ে দৈহিক ও বাচনিক সংযম রক্ষা করেন, (৯) তাঁর চিত্ত উন্নতি-অভিমুখী থাকে এবং (১০) তিনি ভিক্ষু সংজ্ঞার অন্তর্গত হন। এই দশ প্রকার গুণ যা গৃহী দুঃশীল অপেক্ষা ভিক্ষু দুঃশীলের অধিকতর বিশেষত্ব প্রমাণিত করে। জলে প্রাণ আছে কি নেই এই সম্পর্কে ভদন্ত নাগসেন বলেছেন জলের কোন প্রাণ নাই।

সপ্তম বর্গ

নিষ্প্রপঞ্চ প্রশ্ন, গৃহীর অর্হত্ব, অর্হতের স্মৃতি ভ্রম, লোকে নাস্তিত্ব, অনুৎপন্ন নির্বাণ, উৎপত্তির কারণ, যক্ষের শব, শিক্ষাপদ, সূর্যের তাপ, সূর্য কিরণের তারতম্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে 'মিলিন্দপ্রশ্ন' গ্রন্থে কথোপকথন হয়েছে।[১১] রাজা মিলিন্দের প্রশ্নের উত্তরে আয়ুষ্মান নাগসেন প্রপঞ্চ মুক্তি বলতে স্রোতাপত্তি ফল লাভ, সকৃদাগামী ফল লাভ, অনাগামী ফল লাভ এবং অর্হত্ব ফল লাভকে বুঝিয়েছেন। গৃহী আচার্য ব্যতীত স্বয়ং অর্হৎ লাভ করতে পারে না। যদি কোন গৃহী অর্হত্ব লাভ করেন, তবে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে তখনই পরিনির্বাণ লাভ করতে হবে। অর্হতের স্মৃতিভ্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে অর্হতরা স্মৃতিভ্রম মুক্ত। কিন্তু তাঁরা আপত্তি প্রাপ্ত হন। লোকে নাস্তিত্ব বিষয়ে আয়ুষ্মান নাগসেন বলেছেন, এই জগতের তিন অবস্থা নাই। যথা: (১) সচেতন কিংবা অচেতন সংসারে অজর অমর কোন কিছু নাই, (২) সংস্কার সমূহের নিত্যতা নাই, (৩) পরমার্থ হিসাবে সত্ত্বোপলব্ধি বা আত্মা নাই। এই জগতে যা কর্ম, হেতু কিংবা ধাতু হতে উৎপন্ন হয় না, তা হলো দুই অবস্থা। যথা: (১) নির্বাণ কর্ম, হেতু ও ঋতু হতে উৎপন্ন হয় না। নির্বাণ উৎপাদনের যোগ নয়। এই কারণে নির্বাণের উৎপত্তির হেতু নাই। নির্বাণ সাক্ষাৎকারের মার্গ বলতে পারা যায় কিন্তু নির্বাণের উৎপত্তির হেতু প্রদর্শন করা যায় না। যেমন কোন ব্যক্তি আপন শক্তি দ্বারা পর্বতরাজ হিমালয়ে গমন করতে পারে কিন্তু হিমালয় পর্বতকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে পারে না। তেমনি নির্বাণ সাক্ষাতের মার্গ রয়েছে কিন্তু নির্বাণের হেতু নাই। জগতে যে সকল সচেতন জীব আছে সে সমস্তই

কর্মের কারণে উৎপন্ন হয়। অগ্নিও সমগ্র বীজ হতে জ্ঞাত বস্তুগুলো হেতুর কারণে উৎপন্ন হয়। আর পৃথিবী, পর্বতরাজি, জল ও বায়ু ইত্যাদি ধাতুর কারণে উৎপন্ন হয়। আকাশ আর নির্বাণ এই দুই কর্ম, হেতু ও ধাতু কোন কারণে উৎপন্ন হয় না। যক্ষদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, জগতে যক্ষ রয়েছে। যাদের দেখা যায় না। যক্ষগণ নিজ নিজ যোনি হতে চ্যুতি হয়। তাদের মৃত দেহ কীটরূপে, ক্রিমিরূপে, পিঁপড়ারূপে, পতঙ্গরূপে, পক্ষীরূপে অথবা পশু রূপে দেখা যায়। সূর্যের তাপ ও তারতম্য সম্পর্কে আয়ুষ্মান নাগসেন উত্তর দেন- সূর্য সকল সময়ে প্রখর তাপ দেয়, কোন কালে মন্দ তাপ দেয় না। সূর্যের চার প্রকার রোগ রয়েছে, যার কারণে সূর্যের তাপ কমে যায়। যথা: (১) বাদল সূর্যের রোগ, যাতে আক্রান্ত হলে সূর্যের তাপ মন্দ হয়, (২) কুয়াশা সূর্যের রোগ, যাতে আচ্ছন্ন হলে সূর্যের তাপ কমে যায়, (৩) মেঘ সূর্যের রোগ, সেই রোগে গ্রাস করলে সূর্যের তাপ মন্দ হয়, আর (৪) রাহু সূর্যের রোগ, সেই রোগে গ্রাস করলে সূর্যের তাপ মন্দ হয়। গ্রীষ্মকালে ধূলিকণা পূর্ণ থাকে আকাশ। সেই কারণে সূর্যের কিরণ প্রখর হয় না আর হেমন্তকালে আকাশ মেঘমুক্ত থাকে তাই সূর্য কিরণ প্রখর হয়।

অষ্টম বর্গ

অষ্টম বর্গে যে সমস্ত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে তা হলো বেস্সন্তর রাজার দান, গৌতমের দুষ্কর চর্যা, মৃত লোকের উদ্দেশ্যে দান, স্বপ্নদর্শন, অকাল মৃত্যু, চৈত্যের অলৌকিকত্ব, ধর্মজ্ঞান, নির্বাণ পরম সুখ, নির্বাণ সাক্ষাৎকার, অগ্নি প্রভৃতির বাইরে গমন, নির্বাণের অবস্থান। বোধিসত্ত্ব রাজা বেস্সন্তর সকল বোধিসত্ত্বের মতো নিজের স্ত্রী ও পুত্রদের দান করেন। এই অসাধ্য সাধনের জন্য বোধিসত্ত্বের কীর্তিঘোষ দশ সহস্র লোক ধাতুর দেব-মানবদের মধ্যে প্রসারিত ও প্রশংসিত হয়েছিলেন। এতে বোধিসত্ত্বের দশবিধ গুণ জানা যায়। যথা: (১) অপৃধ্নুতা, (২) সাংসারিক বিষয়ে উদাসীনতা, (৩) ত্যাগ, (৪) বৈরাগ্য, (৫) সংকল্পে দৃঢ়তা, (৬) সূক্ষ্মতা, (৭) মহত্ত্ব, (৮) দূরধিগমতা, (৯) দুর্লভতা, (১০) বুদ্ধ-ধর্মের অসাদৃশ্যতা।[১২] রাজা যেমন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য প্রজা কর্তৃক কর আদায় করে তা গরীব-দুঃখী প্রজাদের দান করে পুণ্য লাভ করেন, তেমনি বোধিসত্ত্ব নিজ স্ত্রী-পুত্রদের দান করে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন। জগতের সকল বোধিসত্ত্বের দুষ্কর চর্যা করতে হয়নি, কেবল গৌতমই দুষ্কর চর্যা পালন করেছিলেন বুদ্ধত্ব লাভের জন্য। পাপ ও পুণ্যের মধ্যে পুণ্যই অধিক বলবান। পুণ্যের ফলই রাজা মান্ধাতা, রাজা নিমি, রাজা স্বাধীন, গুপ্তিল গন্ধর্ব এই চারজন দান, শীল পালন করে, এবং উপোসথ ব্রত রক্ষা করে প্রত্যক্ষ জীবনে এই দেহে স্ব-শরীরে দেবলোকে উপনীত হয়েছেন। মৃত লোকের উদ্দেশ্যে দান করলে যারা নরকে, নিচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তারা তার ফল লাভ করতে পারে না। কেবল যারা 'পরদেত্তোপজীবী' প্রেত হয়ে আছেন তারা লাভ করতে পারে। পরবর্তীতে এই ফল বিফল হয় না। কেননা দাতাদের এই ফল লাভ হয়। যেমন কোন আত্মীয়ের বাড়িতে যদি উপহার নিয়ে যাওয়া হয় আর সেই আত্মীয় যদি তা গ্রহণ না করে তবে তা যেমন যার উপহার সামগ্রী তার থাকবে, তেমনি দাতারাই এর ফল ভোগ করে থাকে।

মানুষ ছয়টি কারণে স্বপ্ন দেখে থাকে। তবে এর মধ্যে পূর্ব নিমিত্ত যে স্বপ্ন তাই কেবল সত্য হয়। বাকি যত কারণেই স্বপ্ন দেখা হোক না কেন সব মিথ্যা। অকাল মৃত্যু নিয়ে এই বর্গে বলা হয়েছে- সাত প্রকার লোক আয়ু থাকলেও অকাল মৃত্যুবরণ করেন। যথা:

(১) ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে ভোজন না করালে;

(২) পিপাসিত ব্যক্তি পানীয় লাভ না করলে;

(৩) সর্পদষ্ট ব্যক্তি বিষ বেগে আহত অবস্থায় চিকিৎসা লাভ না হলে;

(৪) বিষ ক্লিষ্ট মানুষ ঔষধ লাভ না করালে;

(৫) অগ্নিদগ্ধ মানুষ জ্বলন্ত অবস্থায় নির্বাপণ লাভ না করালে;

(৬) জলে নিমজ্জিত ব্যক্তি আশ্রয় লাভ না করালে;

(৭) শরবিদ্ধ ব্যক্তি ও ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তি চিকিৎসক লাভ না করালে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আট প্রকার জীবের মৃত্যু ঘটে থাকে। যথা:

(১) বায়ুর প্রকোপে, (২) পিত্তের প্রকোপে, (৩) কফের প্রকোপে, (৪) সন্নিপাত দ্বারা, (৫) ঋতুর পরিণতিতে, (৬) বিষম ব্যবহারে, (৭) বাইরের কোন উপক্রম দ্বারা, (৮) কর্ম বিপাক বশতঃ জীবগণের মৃত্যু হয়ে থাকে। নির্বাণ সম্পর্কে এই বর্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। নির্বাণ অমৃত, নির্বাণ পরম সুখ, নির্বাণ অসদৃশ, নির্বাণের স্বরূপ আকার, বয়স ও পরিমাণ উপমা যুক্তি ও প্রণালী দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না। কেবল যে ব্যক্তি নির্বাণ সাক্ষাৎগ্রহণ করেন সেই বুঝতে পারেন। নির্বাণ কাল-ভেদ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

● অনুমান প্রশ্ন

'অনুমান প্রশ্ন' হলো 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থের পঞ্চম বিভাগ। এ বিভাগে রাজা মিলিন্দ ও আয়ুষ্মান নাগসেন যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তা হলো-

বুদ্ধের ধর্ম নগর, ফুলের দোকান, গন্ধের দোকান, ফলের দোকান, সংবৎসরের আম, ঔষধের দোকান, ভেষজ দ্রব্যের দোকান, অমৃতের দোকান, রত্নের দোকান, শীল রত্ন, সমাধি রত্ন, প্রজ্ঞা রত্ন, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন রত্ন, প্রতিসম্ভিদা রত্ন, তরুণ যোদ্ধা, বোধ্যঙ্গ রত্ন, সর্ব দ্রব্যের দোকান, ধর্ম নগরের নাগরিক, ধর্ম সেনাপতি, ধর্ম নগরের পুরোহিত, ধর্ম নগরের বিচারক, ধর্ম নগরের প্রকাশক, রক্ষক, রূপদক্ষ, মালাকার, ফল বিক্রেতা, গন্ধ বিক্রেতা, নিপুন পিপাসু, প্রহরী, আইনজীবী, শ্রেষ্ঠী, বিখ্যাত আইনজ্ঞ।[১৩]

বুদ্ধের ধর্মনগর

বুদ্ধের ধর্মনগর বলতে মহামানব গৌতম বুদ্ধের ধর্ম দেশনা অনুযায়ী যারা ধর্ম চর্চা করে যান, অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু, শ্রমনগণ, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম বাণীর মূলকথা ও চিরমুক্তির পথ নির্বাণ লাভের সাধু-সাধকগণ প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে। ভগবানের নির্মিত ধর্মনগরের চারদিকে শীল প্রকার পরিবেষ্টিত আছে। পাপে লজ্জারূপ পরিখা

রচিত হয়েছে। সদরদ্বারে জ্ঞানরূপ প্রহরী রয়েছে। বীর্যের খিলান, শ্রদ্ধা আবরণ, সতর্কতারূপ দ্বারপাল, প্রজ্ঞার প্রসাদ, সূত্রান্তরূপ উদ্যান, অভিধর্মরূপ চৌরাস্তা, বিনয়রূপ ন্যায়ালয়, স্মৃতি উপস্থাপনের সরণি আছে। এই সমস্ত কিছুই হলো বুদ্ধের ধর্মনগর।

ধর্ম সেনাপতি

যে সকল ভিক্ষু অপরিমিত জ্ঞান, সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত, তুলীয় গুণশালী, অতুল যশবান, অতুল বলবান, অতুল তেজবান, ধর্ম-চক্রের অনুপ্রবর্তনকারী এবং প্রজ্ঞার শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন, সে সকল ভিক্ষু ভগবানের ধর্ম নগরের 'ধর্ম-সেনাপতি' নামে অভিহিত।

ধর্ম নগরের পুরোহিত

যে সকল ভিক্ষু ঋদ্ধিমান, যাঁরা প্রতিসম্ভিদা অধিগত হয়েছেন, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়েছেন, আকাশচারী, দুরাসাদ, দুঃসহ, পরের উপর নির্ভরশীল নয়, সমুদ্র ও পাহাড়সহ সমগ্র মেদিনীকে কাঁপাতে পারেন, চন্দ্র-সূর্যকেও স্পর্শ করতে পারেন, নিজের রূপ পরিবর্তন করতে পারেন, মনের দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চভিলাষ পূর্ণ করতে পারেন এবং ঋদ্ধিতে পারঙ্গম হয়েছেন- এই সমস্ত ভিক্ষুরা ধর্ম নগরের পুরোহিত।

ধর্ম নগরের বিচারক

যে সমস্ত ভিক্ষু ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করেন, নিজের দেহ এবং জীবনের প্রতি উদাসীন, অর্হৎ পদপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং যিনি ধুতাঙ্গ পালনকে অগ্রে স্থান দেন- সেই ভিক্ষুগণকে মহামানব গৌতম বুদ্ধের ধর্ম নগরের বিচারক বলা হয়।

নগর প্রকাশক

যে সকল ভিক্ষু পরিশুদ্ধ নির্মল, কুলুষরহিত চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে কুশল এবং দিব্য দৃষ্টিতে পূর্ণ হয়েছেন, তাঁরা বুদ্ধের ধর্মনগরের প্রকাশক।

ধর্ম নগরের রক্ষক

যে ভিক্ষু বড় বিদ্বান, আগম বিশেষজ্ঞ ধর্মধর, বিনয়ধারী, মাতৃকাকে মনে রাখে, শিথিল, ধ্বনিত, দীর্ঘ, হ্রস্ব, গুরু, লঘু প্রভৃতি উচ্চারণে কুশল এবং নব অঙ্গযুক্ত বৌদ্ধ ধর্মকে জানেন- তাঁরা ভগবানের ধর্ম নগরের রক্ষক।

ফুলের দোকান

অর্হত্বগণ সকল প্রকার অবিদ্যা, অনিত্য, অনাত্মা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। তাঁরা জরা-মরণ হতে মুক্তি লাভের অভিলাষী হন। ধ্যান বিষয় অনুশীলনের দ্বারা সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ, মোহ বর্জন করে মার্গফলে উপনীত হয়ে চিত্তকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করেন। একে বুদ্ধের ফুলের দোকান বলা হয়।

গন্ধের দোকান

ভগবান বুদ্ধের দেশিত শীলসমূহ বিশ্বকে সুগন্ধময় করে তোলে, পরিপূর্ণ করে। এই শীলের গন্ধ দিক্-বিদিকের বায়ুর অনুকূল ও প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়ে সুগন্ধি ছড়ায়। মূলত এই শীলসমূহ হলো বুদ্ধের গন্ধের দোকান।

শীলসমূহ হলো- শরণশীল, পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচারী শীল, দশাঙ্গশীল, পঞ্চবিধ উদ্দেশ্যের অন্তর্গত প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল।

ফলের দোকান

বুদ্ধের ফলের দোকান বলতে স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী ফল, অর্হত্ব ফল, শূন্যতা ফল সমাপত্তি, অনিমিও ফল সমাপত্তি, অপ্রনিহিত ফল সমাপত্তি। সাধক তাঁর কর্ম মূল্য দিয়ে এই সমস্ত ফল ক্রয় করেন।

সংবৎসরের আম

বারমাসী আম যেমন যখন খুশি তখন লাভ করা যায়, তেমনি বুদ্ধের আমসদৃশ স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী ফল, অর্হত্ব ফল, অপ্রনিহিত ফল, সমাপত্তি ফল কর্মমূল্য দিয়ে সাধক যখন খুশি তখন লাভ করে থাকেন।

ঔষধের দোকান

বুদ্ধ তাঁর ঔষধ দিয়ে দেব-মানবের সমগ্র সংসারকে কলুষ-বিষ হতে মুক্ত করেন। বুদ্ধের এই ঔষধ হলো (১) দুঃখ আর্যসত্য, (২) দুঃখ সমুদয় আর্য সত্য, (৩) দুঃখ-নিরোধ আর্য সত্য ও (৪) দুঃখ-নিরোধগামী মার্গ আর্য সত্য।[১৪]

ভেষজ দ্রব্যের দোকান

বুদ্ধের ভেষজ দ্রব্যের দোকানের দ্রব্য হলো চার স্মৃতি উপস্থাপন, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধি-অঙ্গ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। বুদ্ধ এই সমস্ত ভেষজ দ্রব্য দিয়ে সাধকের মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম ও সকল প্রকার অবিদ্যা দূর করেন।

অমৃতের দোকান

বুদ্ধের অমৃতের দোকান বলতে কায়-গত স্মৃতিকে বোঝানো হয়েছে। এই অমৃতের দোকান দিয়ে দেব-মানবেরা জন্ম-জরা-ব্যাধি, মৃত্যু-শোক-রোদন, দুঃখ-দুশ্চিন্তা ও মনস্তাপ হতে পরিমুক্ত হয়।

রত্নের দোকান

বুদ্ধের রত্নের দোকানের রত্নসমূহ দিয়ে বুদ্ধ পুত্রগণ কান্তিমান, দীপ্তিমান, প্রভামান, ভাস্বর, উজ্জ্বল ও সমুজ্জল হন, ঊর্ধ্ব, অধঃ চতুর্দিক আলো প্রদর্শন করেন; সেই রত্নসমূহ হলো: শীল রত্ন, সমাধি রত্ন, প্রজ্ঞা রত্ন, বিমুক্তি রত্ন, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন-রত্ন, প্রতিসম্ভিদা রত্ন, বোধ্যঙ্গ রত্ন।

শীলরত্ন

যে সমস্ত লোক 'শীলরত্ন' দিয়ে বিভূষিত হন, তাঁকে দেখে দেবতা, মনুষ্য, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলে আকাঙ্খা করেন ও প্রার্থনা করেন। ভিক্ষু শীলাভরণে সুসজ্জিত হয়ে নিজের শোভা দ্বারা দিকে, অনুদিকে, উপরে, নিচে এবং পার্শ্বদেশসমূহ উজ্জ্বল করেন, সমুজ্জ্বল করেন। তিনি সকল মারকে পরাজয় করেন। এই শীল

রত্ন হলো- প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল, ইন্দ্রিয় সংবরশীল, আজীব পরিশুদ্ধি শীল, প্রত্যয় সংমিশ্রিত শীল, লঘু শীল, মধ্যম শীল, মহা শীল, মার্গ শীল ও ফল শীল।

সমাধি রত্ন

বুদ্ধের 'সমাধি রত্ন' হলো- সবির্তক-সবিচার সমাধি, অবির্তক-বিচার-মাত্র সমাধি, অবির্তক অবিচার সমাধি, শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি, অপ্রনিহিত সমাধি। এই সমাধি রত্ন দিয়ে সুসজ্জিত ভিক্ষুর কাম বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক, মান, ঔদ্ধতা, ভ্রান্ত দৃষ্টি, সংশয়, বিবিধ কুলুষের বিষয় ও কুবির্তক আছে; সেই সব সমাধির প্রভাবে বিলীন হয়, নষ্ট হয়, বিধ্বংস হয় ও লিপ্ত থাকে না।

প্রজ্ঞা রত্ন

'প্রজ্ঞা রত্ন' বলতে যা দিয়ে আর্যশ্রাবক সকল প্রকার অবিদ্যা, দুঃখ, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে যথাযথ জানতে পারে তাকে বুঝায়। এই প্রজ্ঞা রত্নের দ্বারাই ভিক্ষু নির্বাণ লাভ করেন।

বিমুক্তি রত্ন

অর্হত্ব পদকে বিমুক্তি রত্ন বলা হয়। অর্হৎ পদ লাভী ভিক্ষু বিমুক্তি রত্ন দিয়ে সুশোভিত হন। উপমায় বলা হয়েছে কোন লোক যেমন মণির হার, মুক্তার হার ও প্রবালের হার দিয়ে সুসজ্জিত হন, তেমনি বিমুক্তি রত্ন পরিহিত অর্হত্বপ্রাপ্ত ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু স্বীয় বিমুক্তি দিয়ে কান্তিমান, দীপ্তিমান, আলোকিত হন।

প্রতিসম্ভিদা রত্ন

প্রতিসম্ভিদা রত্ন চার প্রকার। যথা- (১) অর্থ প্রতিসম্ভিদা, (২) ধর্ম প্রতিসম্ভিদা, (৩) নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা, (৪) প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা। এই চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা রত্ন দিয়ে সজ্জিত হয়ে ভিক্ষু যে যে সভায় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, গৃহস্থ কিংবা শ্রমণ সভায় গমন করেন, সেই সভায় তিনি নিপুণ, নিঃসঙ্কোচ, নির্ভীক, নিরাতঙ্ক ও রোমাঞ্চহীনভাবে গমন করেন।

বোধ্যঙ্গ রত্ন

'বোধ্যঙ্গ রত্ন' দিয়ে ভিক্ষু মোহতমকে পরাজিত করে দেবসহ এই মরলোককে দীপ্তিমান করেন, সমুজ্জ্বল করেন এবং আলোকিত করেন। এই বোধ্যঙ্গ রত্ন হলো সাত প্রকার। যথা (১) স্মৃতি সম্বোধি অঙ্গ, (২) ধর্ম-বিচয় সম্বোধি অঙ্গ, (৩) বীর্য সম্বোধি অঙ্গ, (৪) প্রীতি সম্বোধি অঙ্গ, (৫) প্রশান্তি সম্বোধি অঙ্গ, (৬) সমাধি সম্বোধি অঙ্গ, (৭) উপেক্ষা সম্বোধি অঙ্গ।

বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন রত্ন

যে জ্ঞান দিয়ে আর্য-শ্রাবক নিজের সাধনালব্ধ আর্য-মার্গ, আর্য-ফল, অসংজাত নির্বাণ, প্রহীন ক্লেশ ও অবশিষ্ট ক্লেশকে প্রত্যবেক্ষণ করেন। সেই পাঁচ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানকে ভগবানের বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন রত্ন বলা হয়।[১৫]

ধর্ম নগরের রূপদক্ষ

যে ভিক্ষু বিনয় বিশেষজ্ঞ, বিনয়ের গূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন, স্থানাস্থান (নিদান পদ্‌গল বস্তু) কুশল, আপত্তি, অনাপত্তি, গুরু-লঘু আপত্তি, কুশল, সুচিকিৎসা, অচিকিৎসা, উত্থানগামী, দেশনাগামী, নিগ্রহ-প্রতিকার, অপসারণ, নিঃসারণ, প্রতিসারণ বিষয়ে সুদক্ষ এবং বিনয়ে যা কিছু জ্ঞাতব্য তা জেনেছেন– তাঁরা ভগবানের 'ধর্ম নগরে রূপদক্ষ' নামে কথিত হন।

এ রকম মহামানব গৌতম বুদ্ধের ধর্ম দেশনা অনুযায়ী যারা জ্ঞান লাভ করেন, ধর্ম জ্ঞান পালন করেন এবং যুগে যুগে কালে কালে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধিতে যাদের অবদান অপরিসীম তারাই বুদ্ধের ধর্মনগরের মালাকার, ফল বিক্রেতা, গন্ধ বিক্রেতা, জ্ঞান পিপাসু, প্রহরী, আইনজীবী, শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসেবে পরিচিত।

● উপমাকথা-প্রশ্ন

'উপমাকথা প্রশ্নে' একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর অর্হত্ব লাভের জন্য যে সমস্ত গুণ দরকার তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উপমাকথা-প্রশ্ন হলো মিলিন্দ প্রশ্নের ৬ষ্ঠ বিভাগ ও শেষ বিভাগ। এই বিভাগে সাতটি বর্গ রয়েছে। যথা: (১) গর্ধভ বর্গ, (২) সমুদ্র বর্গ, (৩) পৃথিবী বর্গ, (৪) উপচিকা বর্গ, (৫) সিংহ বর্গ, (৬) মকট বর্গ, (৭) কুম্ভক বর্গ।

(১) গর্ধভ বর্গ:

গর্ধভ বর্গে রাজা মিলিন্দ ও আয়ুষ্মান নাগসেনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গর্ধভ, মুরগী, কাঠ-বিড়ালী, চিতা বাঘ, চিতা বাঘিনীর, কূর্ম, বাঁশ, ধনু, কাক ও বানরের গুণ প্রকাশ করা হয়েছে। এই সমস্ত গুণ একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর অর্হত্ব লাভের জন্য অর্জন করা প্রয়োজন। গর্ধভ আবর্জনা স্তুপে, চৌমাথায়, চৌরাস্তায়, গ্রামের দরজায়, ভূমির তৃণপুঞ্জে অথবা যে কোন স্থানে শয়ন করে, কিন্তু নিদ্রাবহুল হয় না। তেমনি যোগ-সাধনাকারী যোগীও তৃণ-মাদুরে পত্র-মাদুরে, কাঠের মঞ্চে, মাটিতে কিংবা যে কোন স্থানে চর্মখণ্ড বিছিয়ে শয়ন করে, কিন্তু নিদ্রাবহুল হতে পারে না।

মোরগের পাঁচটি গুণ রয়েছে। মোরগ ঠিক সময়ে শয়ন করে, পুনরায় ঠিক সময়ে জাগ্রত হয়, মাটি আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে খাদ্য গ্রহণ করে, চোখ থাকতেও রাতের বেলায় অন্ধ হয়ে যায়, লাঠি কিংবা মুগুর দ্বারা উপদ্রুত হলেও নিজের গৃহ ত্যাগ করে না। সাধকও মোরগের মতো সঠিক সময়ে শয়ন ও জাগ্রত হবেন। শরীর ধারণের জন্য যেটুকু খাওয়া দরকার সেটুকু আহার করবেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু যখন গ্রামে ভিক্ষাচরণ করবে তখন তাঁর মনকে আকর্ষণকারী দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্যের প্রতি অন্ধ, বধির ও বোবার মত আচরণ করবে। সাধক তাঁর সাধনা থেকে কখনই পিছু হাঁটবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে তাঁর অভিন্ন লক্ষ্য নির্বাণ লাভ করে।[১৬] এ রকম একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর অর্হত্ব লাভের জন্য কাঠ-বিড়ালের একগুণ, চিতা বাঘিনীর একগুণ, চিতা বাঘের এক গুণ, কর্মের

পাঁচগুণ, বাঁশের একগুণ, ধনুর একগুণ, কাকের দুই গুণ, বানরের দুই গুণ সদৃশ নিজের মধ্যে এমন গুণ থাকা প্রয়োজন।

(২) সমুদ্র বর্গ

'সমুদ্র বর্গে' আয়ুষ্মান নাগসেন বলেছেন, অলাবু লতার দুই গুণ, পদ্মের তিন গুণ, বীজের দুই গুণ, শাল তরুর একগুণ, নৌকার তিন গুণ, নোউরের দুই গুণ, মান্তুলের একগুণ, কর্ণধারের তিনগুণ, কর্মকারের একগুণ এবং সমুদ্রের পাঁচগুণ রয়েছে। এই সমস্ত গুণ একজন যোগীর অর্জন করতে হবে। সমুদ্রের পাঁচটি গুণ হলো-

সমুদ্র নিজের মধ্যে কোন প্রাণীর মৃত দেহকে থাকতে দেয় না। তেমনি যোগ সাধনা নিরত ভিক্ষুর নিজের অভ্যন্তরে রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, আতৃদৃষ্টি, চাটুতা, স্তাবকতা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, কুটিলতা-দুশ্চরিত্র ও ক্লেশরূপ মলের সাথে বাস করা অনুচিত। মহাসমুদ্র নিজের মধ্যে মণি, মুক্তা, বৈদুর্য, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, স্ফটিকমণি প্রভৃতি বিবিধ রত্ননিচয় ধারণ করে। এগুলোকে গোপনে রক্ষা করে, বাইরে নিক্ষেপ করে না। তেমনি যোগ-সাধনা নিরত ভিক্ষুর নিজের মধ্যে মার্গ, ফল, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সম্পত্তি, বিপশ্যনা ও অভিজ্ঞা প্রভৃতি বিবিধ গুণরত্ন অর্জন করে তা গোপন রাখা উচিত। বাইরে প্রকাশ করা উচিত না। সমুদ্র বড় বড় জীবদের সঙ্গে থাকে। যোগ সাধনা নিরত ভিক্ষুর পক্ষে স্বল্পেচ্ছু, মিতভাষী, সদাচারী, পরিশুদ্ধাজীবী, আচারসম্পন্ন, লজ্জাপরায়ণ, কোমলস্বভাব, গভীর, মানবীয়, বক্তা, ভাষণে সুদক্ষ, উৎসাহদাতা, পাপ-নিন্দুক, পরোপদেশক, অনুশাসক, পর বিজ্ঞাপক, সৎপথ প্রদর্শক, প্রেরণাদাতা, উৎসাহ বর্ধক, হর্ষোৎপাদক ও কল্যাণমিত্র সব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে বাস করা উচিত।

– মহাসমুদ্র নব সলিলসম্পন্ন-গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, নরভূ, মহা আদি শত সহস্র নদী হতে আগত জলধারা এবং আকাশের মেঘ ধারায় পরিপূর্ণ হলেও নিজের বেলাভূমি কখনো লঙ্ঘন করে না। তেমনি যোগ-সাধনা নিরত ভিক্ষুর লাভ, সৎকার, প্রশংসা, বন্দনা, সম্মান ও পূজা প্রভৃতির কারণে বা জীবন রক্ষার জন্য জ্ঞাতসারে শিক্ষাপদ সমূহ লঙ্ঘন করা অনুচিত।

–মহাসমুদ্র যেমন গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভু, মহী প্রভৃতি সমস্ত নদীর প্রবাহিত জলধারা এবং আকাশ হতে বর্ষিত জলধারা দিয়ে পরিপূর্ণ হয় না। তেমনি যোগসাধনা নিরত ভিক্ষুর কখনও শিক্ষায়, ধর্মীয় আলোচনায়, উপদেশ শ্রবণে, তা ধারণ করায়, তা পরীক্ষায়, অভিধর্ম বিনয় ও সূত্রের গভীর বিষয় অধ্যয়নে, বিগ্রহ বাক্য বিন্যাস, পদসন্ধি, পদবিভক্তি ও নব অঙ্গযুক্ত উত্তম বুদ্ধবাণী শ্রবণের সময়ও পরিতৃপ্ত হওয়া যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়।

(৩) পৃথিবী বর্গ

মিলিন্দ প্রশ্নের উপমাকথা প্রশ্নের অন্যতম বর্গ হলো 'পৃথিবী বর্গ'। পৃথিবী বর্গে আলোচনা করা হয়েছে- পৃথিবীর পাঁচগুণ, জলের পাঁচগুণ, তেজের পাঁচ গুণ, বায়ুর পাঁচ গুণ, পর্বতের পাঁচগুণ, আকাশের পাঁচগুণ, চন্দ্রের পাঁচগুণ,

সূর্যের সাত গুণ, ইন্দ্রের তিন গুণ, চক্রবর্তী রাজার চার গুণ। এই সমস্ত গুণাবলি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর মধ্যে থাকা চাই। পৃথিবীর পাঁচগুণে বলা হয়েছে পৃথিবী যেমন ইষ্ট বা অনিষ্ট, কর্পূর, অগুরু, টগর, চন্দন, কুম্‌কুম্‌ আদি নিক্ষেপ করলে কিংবা পিত্ত, কফ, পুঁজ, রক্ত, ঘর্ম, মেদ, থুথু, শিক্‌নি লালা, মূত্র, বিষ্ঠা প্রভৃতি নিক্ষেপ করলেও একই সমান থাকে, তেমনি যোগসাধনা নিরত ভিক্ষুর ইষ্ট-অনিষ্ট, লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ সব বিষয়ে সমান থাকা উচিত, পৃথিবী সাজ-সজ্জা করে না। নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে সুশোভিত থাকে। নিরন্তর অখণ্ড, অছিদ্র, গর্তহীন, গভীর ঘনভাবে বিস্তৃত থাকে। পৃথিবী গ্রাম, নিগম, নগর, জনপদ, বৃক্ষ, পর্বত, নদী, সরোবর পুষ্করিণী এবং পশু-পক্ষী, মানুষ, নর-নারী সকলকে ধারণ করলেও কখনো অবসন্ন হয় না। কোন কিছুর প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ হয় না। তেমনি যোগ সাধনা নিরত ভিক্ষু সব সময় পৃথিবীর মতো তাঁর চিত্তকে সাম্য ভাবাপন্ন হওয়া উচিত।[১৭] এ রকম পৃথিবী বর্গের অভ্যন্তরে যতগুলো প্রাণী ও পদার্থের গুণ রয়েছে সবই একজন অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুর থাকা উচিত।

(৪) উপচিকা বর্গ: উপচিকা বর্গ হলো মিলিন্দ প্রশ্নের 'উপমাকথা প্রশ্ন' বিভাগের চতুর্থ বর্গ। এতে পিপীলিকার এক গুণ, বিড়ালের দুই গুণ, ইঁদুরের এক গুণ, বৃশ্চিকের এক গুণ, নকুলের এক গুণ, জড় শৃগালের দুই গুণ, মৃগের তিন গুণ, গরুর চার গুণ, বরাহের দুই গুণ, হস্তীর পাঁচ গুণ আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত গুণ একজন অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুর থাকা দরকার। উই পোকার এক গুণ হলো- উইপোকা উপরে আবৃত করে, নিজেকে গোপন রেখে খাদ্যের জন্য সর্বদা বিচরণ করে। তেমনি সাধনা নিরত যোগীর শীল-সংযম দ্বারা নিজের মনকে আবৃত ও সংযত রেখে ভিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে গমন করা উচিত।

(৫) সিংহবর্গ: 'সিংহবর্গ' হলো উপমাকথা প্রশ্ন বিভাগের পঞ্চম বর্গ। এ বর্গে একজন সাধকের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার তা হলো সিংহের সাত গুণ, চক্রবাকের তিন গুণ, পেণাহিক পক্ষীর দুই গুণ, গৃহকপোতের এক গুণ, উলুকের দুই গুণ, সরস পক্ষীর এক গুণ, বাদুড়ের দুই গুণ, জলৌকার এক গুণ, সর্পের তিন গুণ, অজগরের এক গুণ। সিংহের সাত গুণ হলো- সিংহ শুভ্র, বিমল, পরিশুদ্ধ, সমুজ্জ্বল থাকে; চার পদের উপর অতি বিক্রমে চলে; উজ্জ্বল কেশর সম্পন্ন; কারো কাছে অবনমিত হয় না; যে স্থানে শিকার পতিত হয়, সেই স্থানেই প্রয়োজনমত ভক্ষণ করে; নিজের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে না; খাদ্য না পেলে ত্রাসিত হয় না। ঠিক তেমনি অর্হত্ব লাভের অধিকারী একজন ভিক্ষুকে নিজের মধ্যে সিংহের এই সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক। যেমন- সিংহের মতো চার ঋদ্ধিপাদ চরণে চলা, আহার শান্তভাবে খাওয়া, অধাবিত পরিভোগ করা, কোন খাদ্য না পেলেও ত্রাস না করা, দোষদর্শী, নিঃসরণ– অভিলাষী ও পরিশুদ্ধ থাকা উচিত।

(৬) মকট বর্গ: 'মকট বর্গ' হলো উপমাকথা প্রশ্নের ৬ষ্ঠ বর্গ। এতে মাকড়সার একগুণ, স্তন্যপায়ী শিশুর এক গুণ, স্থল কচ্ছপের এক গুণ, গভীর বনের পাঁচ গুণ, বৃক্ষের তিন গুণ, মেঘের পাঁচ গুণ, মণিরত্নের তিন গুণ, মৃগ-শিকারীর চার গুণ, বড়শি-শিকারির দুই গুণ, ছতারের দুই গুণ আলোচনা করা হয়েছে। তুলনায় বলা হয়েছে, পথ-

মাকড় (মাকড়সা) রাস্তায় নিজের জাল বিস্তার করে বসে থাকে। যদি কোন পোকা, মাছি কিংবা পতঙ্গ সেই জালে আবদ্ধ হয়, তখন সে তাকে ধরে ভক্ষণ করে। তেমনি সাধনা নিরত যোগীকে ছয় দ্বারেতে স্মৃতি উপস্থানরূপ জাল বিস্তার করে বসে থাকতে হবে। যদি তাকে কোন ক্লেশমক্ষিকা এসে পড়ে, তবে সেই স্থানেই তাকে ধরে নিঃশেষ করা উচিত।

(৭) কুম্ভক বর্গ: 'কুম্ভক বর্গ' হলো উপমাকথা প্রশ্ন বিভাগের সপ্তমবর্গ ও শেষ বর্গ। এই বর্গ পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থটির বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে। কুম্ভক বর্গে আয়ুষ্মান নাগসেন যে সমস্ত গুণের কথা বলেছেন যোগীদের অর্হত্ব লাভের জন্য; তা হলো– কলসের এক গুণ, লৌহের দুই গুণ, ছাতির তিন গুণ, ধান্যক্ষেত্রের তিন গুণ, ঔষধের দুই গুণ, ভোজনের তিন গুণ, তীরন্দাজের চার গুণ, রাজার চার গুণ, দ্বারপালের দুই গুণ, নিষাদের এক গুণ, প্রদীপের দুই গুণ, ময়ূরের দুই গুণ, তুরঙ্গের দুই গুণ, শৌন্ডিকের দুই গুণ, স্তম্ভের দুই গুণ, তুলাদন্ডের এক গুণ, খড়ুগের দুই গুণ, মাছের দুই গুণ, ঋণ গ্রাহকের এক গুণ, রোগীর দুই গুণ, মৃতের দুই গুণ, নদীর দুই গুণ, বৃষভের এক গুণ, মার্গের দুই গুণ, শুল্ক গ্রাহকের এক গুণ, চোরের তিন গুণ, বাজপাখির এক গুণ, কুকুরের এক গুণ, চিকিৎসকের তিন গুণ, গর্ভিনী স্ত্রীর দুই গুণ, চামরি গাভীর এক গুণ, টিপি পক্ষীর তিন গুণ, কপোতিকার তিন গুণ, কানার দুই গুণ, কৃষকের তিন গুণ, জাম্বুক শৃগালীর এক গুণ, চঙ্গ (মই) বারকের দুই গুণ, দর্বীর এক গুণ, মহাজনের তিন গুণ, পরীক্ষকের এক গুণ, সারথির (রথচালকের) দুই গুণ, গ্রাম প্রধানের দুই গুণ, দর্জির এক গুণ, নাবিকের এক গুণ।

ঔষধের দুই গুণে বলা হয়েছে- ঔষধে ক্রিমি থাকতে পারে না। তেমনি সাধনা নিরত যোগীর অন্তরে ক্লেশ উৎপাদন করা অনুচিত। ঔষধ যেমন সকল প্রকার বিষকে ধ্বংস করে, তেমনি সাধনা নিরত যোগীর রাগ-দ্বেষ-মোহ-মান ও মিথ্যা দৃষ্টিরূপ বিষকে সর্বপ্রকার ধ্বংস করা উচিত।[১৮]

● ধুতাঙ্গ কথা-প্রশ্ন

এছাড়াও মিলিন্দ প্রশ্নে 'ধুতাঙ্গ কথা-প্রশ্ন' নিয়ে আরো একটি অধ্যায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে ধুতাঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুষ্মান নাগসেন বলেছেন- ধুতাঙ্গের প্রকৃতপক্ষে অষ্টবিংশতি গুণ আছে যে সকল গুণের দ্বারা ধুতাঙ্গ ব্রতসমূহ সকল বুদ্ধের প্রশংসিত ও প্রত্যাশিত হয়।[১৯] সেই গ্রন্থসমূহ হলো- (১) ধুতাঙ্গ পালনকারীর জীবিকা পরিশুদ্ধি হয়, (২) ফল সুখপ্রদ হয়, (৩) জীবন নির্দোষ হয়, (৪) পরকে কোন কষ্ট দেয় না, (৫) তিনি নির্ভয় থাকেন, (৬) কাউকে পীড়ন করেন না, (৭) একান্তভাবে বর্ধিত হয়, (৮) তাঁর পরিহানি হয় না, (৯) অমায়িক হন, (১০) ধুতাঙ্গ তাঁর পালনকারীকে রক্ষা করে, (১১) ধুতাঙ্গ পালনকারী যা ইচ্ছা করেন তাই লাভ করেন, (১২) ধুতাঙ্গব্রতী সকল প্রাণীকে দমন করেন, (১৩) ধুতাঙ্গ সংযমের সহায়ক, (১৪) ধুতাঙ্গ ভিক্ষু জীবনের অনুকূল, (১৫) কারো উপর আশ্রিত থাকে না, (১৬) ধুতাঙ্গব্রতী মুক্ত স্বছন্দ মনে থাকেন, (১৭) ধুতাঙ্গ সাংসারিক রাগ ক্ষয় করে, (১৮) দ্বেষ বা হিংসা ক্ষয় করে, (১৯) মোহ ক্ষয় করে, (২০) ধুতাঙ্গধারীর

অভিমান থাকে না, (২১) কুচিন্তা সমুচ্ছেদ হয়, (২২) সংশয় বিদূরিত হয়, (২৩) অকর্মণ্যতা ধ্বংস হয়, (২৪) অসন্তোষ পরিত্যাগ হয়, (২৫) সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়, (২৬) এর পুণ্য অতুলনীয় হয়, (২৭) পুণ্য অনন্ত হয় এবং (২৮) ধুতাঙ্গ সর্ববিধ দুঃখকে ক্ষয় করে। আর যারা ধুতাঙ্গ ব্রতগুলো সম্যকরূপে পালন করেন তারা অষ্টাদশ গুণে সমন্বিত হন। তের প্রকার ধুতাঙ্গ আছে, যাদের দ্বারা শুদ্ধিপ্রাপ্ত ভিক্ষু নির্বাণ রূপ-মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে অনেক প্রকারের ধর্ম তরঙ্গে হিল্লোলিত হন। রূপ ও অরূপ আট প্রকারের সমাপত্তি লাভ করেন। বিবিধ ঋদ্ধি লাভ করেন। দিব্য শ্রবণ শক্তি লাভ করেন। পরের চিত্তের বিষয় জানতে পারেন, পূর্বজন্মের স্মৃতি লাভ করেন, দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হন এবং সকল আসক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হন। এই তের প্রকার ধুতাঙ্গ হলো:

(১) পাংশুকুলিক, (২) তেচীবরিক, (৩) পিন্ডপাতিক, (৪) সপদানচারিক, (৫) একাসনিক, (৬) পাত্রপিন্ডিক, (৭) পচ্ছভিত্তিক, (৮) আরন্যক, (৯) বৃক্ষমূলিক, (১০) অবেভাকাসিক, (১১) শ্মশানিক, (১২) যথাসন্থতিক এবং (১৩) নৈসজ্যিক। এই তের প্রকার ধুতাঙ্গব্রত যারা পূর্ব হতে পালন করেন, সেবন করেন, নিসেবন করেন, অভ্যাস করেন, পরিচয় করেন, আচরণ করেন, উপাচারণ করেন, পরিপূর্ণ করেন, কেবল তাঁরাই শ্রামণ্য ফল লাভ করেন। দশ সহস্র লোক ধাতুতে লোকাচার্য দশবল বুদ্ধ ছাড়া স্থবির সারিপুত্র অগ্রপুরুষ ছিলেন। তিনিও অপরিমত অসংখ্য কল্প হতে পুণ্য কর্ম সঞ্চয় করেছিলেন। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মনোরম কামরতিও অনেক শত সংখ্যক ঐশ্বর্যকে পরিত্যাগ করে বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। প্রব্রজিত হয়ে তিনি এই তের প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত পালন দ্বারা কায়বাক্য চিত্ত সংযম করেছেন। যার ফলে বর্তমান জীবনে তিনি বহু প্রশংসা পেয়েছেন এবং ভগবান বুদ্ধের শাসনে ধর্ম চক্রের অনুপ্রবর্তক হয়েছেন। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' নামক গ্রন্থে দেবা তিদেব বুদ্ধ বলেছেন-

"ভিক্ষুগণ! সারিপুত্রকে ব্যতীত আর আমি অন্য একজনকেও দেখছি না, তথাগত প্রবর্তিত অনুত্তর ধর্ম চক্রকে উত্তমরূপে পুনরায় চালাতে পারে। ভিক্ষুগণ! সারিপুত্রই আমার প্রবর্তিত অনুত্তর ধর্মচক্রকে উত্তমরূপে পুনরায় চালাতে পারে।"[২০]

তথ্য নির্দেশ:

১. The Questions of King Milinda: T.W.Rhys Davids; Sacred Books of the East Series (S.B. Vols. xxxv-xxxvi) 1933, P.4

২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৮

৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩

৪. মিলিন্দপ্রশ্ন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৭৭, পৃ. ৬৪-৭২

৫. The Questions of King Milinda: T.W.Rhys Davids; Sacred Books of the East Ibid P.73

৬. মিলিন্দপ্রশ্ন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী (বঙ্গানুবাদ), কলকাতা ১৯৭৭, পৃ. ৮৬

৭. The debate of King Milinda: Bhikku Pesala; Buddha Dharma Education Association Inc, Inward Path, Penang, 2001, P. 81

৮. The debate of King Milinda: Bhikku Pesala; Ibid, P. 91

৯. মিলিন্দপ্রশ্ন: ১৬৮

১০. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬১-১৯৪

১১. The debate of king Milinda: Bhikku Pesala; Ibid, P. 159.

১২. 'মিলিন্দপ্রশ্ন' পৃ. ২২৯

১৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৭১-২৮৭

১৪. বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা: জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০১, পৃ. ১২-১৩

১৫. মিলিন্দ প্রশ্ন: প্রাগুক্ত; পৃ. ২৭৯

১৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩০৪

১৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩১৬

১৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪৩

১৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯০

২০. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ গ্রন্থে বর্ণিত বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা

‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ গ্রন্থে মহামানব গৌতম বুদ্ধের বাণী ও ধর্ম দেশনাসমূহ খুব সহজ-সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, কুশল ধর্ম, অকুশল ধর্ম, ত্রিপিটকের অন্তর্ভূক্ত অনেক বিষয় ও তত্ত্বসমূহ এখানে মিলিন্দরাজের প্রশ্ন ও নাগসেনের উত্তর দেওয়ার মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুরূহ তত্ত্বের উপদেশ ও নানা দৃষ্টান্ত, আখ্যায়িকা, উপমা প্রভৃতির সাহায্যে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা যে কেউ তা খুব সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। মিলিন্দ প্রশ্নে বৌদ্ধদর্শন তত্ত্বের যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব
- কুশল ধর্ম (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি)
- প্রজ্ঞা, শীল, সমাধি
- দ্বাদশ নিদান (নাম-রূপ, ষড়ায়তন)
- চার-আর্যসত্য
- আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ
- স্বপ্ন
- বৌদ্ধ অনাত্মবাদ
- প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা
- জন্মান্তরবাদ
- কর্মবাদ
- অর্হত্বের লক্ষণ
- নির্বাণ
- কাল, পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা
- পূজা
- ভূমিকম্প, সংসার ধর্ম, ঋদ্ধিবল, ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ প্রভৃতি।

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহামানব গৌতমবুদ্ধ দীর্ঘ ছয় বছর সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যার ফলে রাত্রির প্রথম যামে নিজের অতীত জন্মের ঘটনাবলি স্পষ্ট ছবির মতো দেখলেন। দ্বিতীয় যামে তিনি সকল প্রাণীর জন্ম-রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন আর তৃতীয় যামে জীব-জগতের কার্যকারণ নীতি উপলব্ধি করে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হতে মুক্তির পথ আবিস্কার করলেন।

তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় সম্বোধি লাভ করে বুদ্ধ হন। এই জগতে তিনি বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান মানুষের কল্যাণে প্রচার করার মনস্থ করলেন। সেই সময় প্রাচীন ভারতে মানুষ যাগযজ্ঞ, পশুবলি, জাতি ও বর্ণভেদসহ নানা অসার মতবাদের শিকার হয়ে এক অন্ধকারময় জীবন যাপন করত। তিনি তাদের এই মিথ্যাচার ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করার জন্য আহ্বান করলেন সেখানে উচ্চারিত হল–

"চরথ ভিখবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায অথায হিতায সুখায়ায় দেবমনুস্মানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ। দেসেথ্, ভিক্খবে, ধম্মং আদিকল্যাণং, মজ্জে কল্যাণং পরিযোসান কল্যাণং, সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবল পরিপুন্নং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেথ। সন্তি সত্তা অপ্পরজক্খজাতিকা, অস্সবনতা ধম্মস্স পরিহাযন্তি, ভবিস্স ধম্মস্স অঞ্ঞাতারো। অহংপি ভিক্খবে, যেন উরুবেলা সেনানিগমো তেনুপসঙ্কমিস্সামি ধম্মদেসনাযা" তি।

অর্থাৎ "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা ধর্ম প্রচারের জন্য বের হও। বহু লোকের হিতের জন্য বহু লোকের মঙ্গলের জন্য জগতের আর্তদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হয়ে দেব মন্যুষের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য দিকে দিকে বিচরণ কর। হে ভিক্ষুগণ তোমরা সদ্ধর্ম প্রচারে ব্রতী হও। পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মর্চয প্রচার কর।

দীর্ঘ ৪৫ বৎসর তিনি পৃথিবীতে সত্যের ধর্ম প্রচার করলেন। এভাবে দীর্ঘ চার যুগ ধর্ম প্রচার করার পর আশি বৎসর বয়সে ৫৪৩ খ্রিস্টপূর্ব সালে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরে মল্লদের শালবনে গৌতমবুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মিলিন্দরাজ শঙ্কা প্রকাশ করলে আয়ুষ্মান নাগসেন বিভিন্ন উপমার সাহায্যে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। যারা কোনদিন সমুদ্র দেখেনি তারা যেমন জানতে পারে সমুদ্র বিশাল, গভীর, অপরিমেয় এবং অগাধ জলরাশি এবং এতে গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভু ও মহী এই পঞ্চ মহানদী গিয়ে পতিত হয়েছে। তেমনি মানুষ নির্বাণপ্রাপ্ত বড় বড় বুদ্ধের শিষ্যদের দেখে জানতে পারে বুদ্ধ ছিলেন অনুত্তর ও মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন নির্বাণগামী মহামানব।

লেখাকাচার্যগণের লেখা দিয়ে যেমন বহু বছর পর তাদের গুণ সম্পর্কে জানা যায়, তেমনি মহামানব গৌতম বুদ্ধের বাণী ও ধর্মদেশনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে বুদ্ধের অনুত্তরত্ব সম্পর্কে জানা যায়। বুদ্ধ ছিলেন সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। সময় উপস্থিত না হলে তিনি শ্রাবকদের নিমিত্ত কোন শিক্ষাপদ প্রণয়ন করতেন না। উচিত সময় হলেই তিনি স্মারকদের জন্য যাবজ্জীবন অলঙ্গনীয় শিক্ষাপদ প্রণয়ন করেছেন। এতে তাঁর সর্বজ্ঞাতা প্রকাশ পায়। বুদ্ধ

প্রকৃতপক্ষে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত, অশীতি অনুব্যঞ্জন শোভিত, সুবর্ণ বর্ণের দেহধারী, কাঞ্চন সদৃশ চর্মবিশিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর শরীর হতে এক ব্যাম পরিমাণ চতুর্দিকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতো। গয়ার বোধিবৃক্ষের নিচে ভগবান যখন সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন, তখনই তাঁর উপসম্পদা হয়। অন্যের প্রদত্ত উপসম্পদা ভগবানের ছিল না, যা অন্য কোন শ্রমণ-ভিক্ষুকে দেওয়া হয়। বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা সম্পর্কে নাগসেন বলেন, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ছিলেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে, সব বিষয়ে সব সময় তাঁর জ্ঞান-দর্শন উপস্থিত থাকবে। বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান মানসিক চেতনার প্রতিফলন সাপেক্ষ। (ধ্যানস্থ হয়ে) মানসিক প্রতিফলন দ্বারা বুদ্ধ যথা ইচ্ছা জানতে পারতেন। যেমন কোন ফলবান বৃক্ষ; ফলভারে অবনত। ফলগুচ্ছে পরিপূর্ণ কিন্তু বৃক্ষের নিচে একটি ফলও পড়ে নি। নিচে ফল পড়েনি বলে কোন মানুষ তা লাভ করতে পারছে না। ফল পতিত হলেই মানুষ তা লাভ করে থাকে। ফল যদি না পড়ে, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, গাছে ফল ধরেনি। তেমনি বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান মানসিক চেতনা সাপেক্ষ। এর দ্বারা তিনি সব বিষয় জানতেন। যখন যে বিষয় জানার দরকার, তিনি তখন তা সম্পর্কে জানতেন। তথাগত সমস্ত অকুশল দগ্ধ করে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর কোন অকুশল অবশিষ্ট ছিল না।

বুদ্ধ পূর্ববর্তী সত্ত্বকে বোধিসত্ত্ব বলে। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যত্নবান সত্ত্বকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়।[১] গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত লাভের পূর্বে পূর্বজন্মে যে সমস্ত সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন তাকে বলা হয় পারমিতা, এর অর্থ পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হওয়া। এ দশ পারমী পূর্ণ করার জন্য গৌতমবুদ্ধ নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে সম্বোধি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দান, শীল, নৈষ্কম্য, সত্য, ক্ষান্তি, বীর্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা ও প্রজ্ঞা পারমী পালন করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে 'মিলিন্দ প্রশ্নে' উল্লেখ করা হয়েছে বোধিসত্ত্বদের মা-বাবা পূর্ব হতেই নিশ্চিত হয়ে থাকে। কোন বৃক্ষের নিচে বোধি লাভ করবেন, তাও নিশ্চিত থাকে। কার অগ্রশাবক হবেন, তাও নিশ্চিত থাকে। কে পুত্র হবেন, তাও নিশ্চিত থাকে। তুষিত দেবলোকে থাকার সময় বোধিসত্ত্ব আটটি প্রধান বিষয় দেখে থাকেন। যথাঃ

(১) মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের কখন উচিত সময় হবে, তা দেখে থাকেন;

(২) কোন দ্বীপে জন্ম নিবেন, তা দেখে থাকেন;

(৩) কোন দেশে জন্ম নিতে হবে, তা দেখে থাকেন;

(৪) কোন কুলে জন্ম নিবেন, তা দেখে থাকেন;

(৫) কে মা হবেন, তা দেখে থাকেন;

(৬) তাঁর আয়ুষ্কাল কতদিন হবে, তা দেখে থাকেন;

(৭) কোন মাসে জন্ম হবে, তা দেখে থাকেন;

(৮) কখন গৃহ-ত্যাগ করবেন,তা দেখে থাকেন।

সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে বোধিসত্ত্বের পাঁচজন আচার্য ছিলেন কিন্তু সম্যক সম্বুদ্ধের কোন আচার্য ছিল না। বোধিসত্ত্বের এই পাঁচজন আচার্য হলেঃ

– বোধিসত্ত্বের প্রথম আচার্য হলেন আটজন ব্রাহ্মণ। যারা বোধিসত্ত্বের জন্ম মাত্রই এসে তাঁর লক্ষণ বিচার করেন, তাঁরা হলেন রাম, ধ্বজ, লক্ষণ, মন্ত্রী, যজ্ঞ, সুষাম, সুভোজ ও সুদত্ত। তাঁরা বোধিসত্ত্বের স্বস্তি প্রকাশ করে রক্ষা-কর্ম করেছেন।

– বোধিসত্ত্বের দ্বিতীয় আচার্য ছিলেন সর্বমিত্র নামক এক ব্রাহ্মণ। তিনি সেই সময় অভিজাত উদিত্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শব্দ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। ব্যাকরণ ও বেদের ষড়অঙ্গের পণ্ডিত ছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন রাজকুমারকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে শান্তি জল সিঞ্চন করে সমর্পণ করেন।

– দেবতা বোধিসত্ত্বকে জ্ঞানান্বেষণে উৎসাহিত করেছিলেন এবং যার বাণী শুনে উদাস ও উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সেই ক্ষণেই তিনি গৃহ-ত্যাগ করে সন্ন্যাস হন, সেই দেবতা তাঁর তৃতীয় আচার্য।

– আড়ার-কলম ঋষি তাঁর চতুর্থ আচার্য ছিলেন, যিনি বোধিসত্ত্বকে আকিঞ্চনায়তন লাভের ধ্যান প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়ে ছিলেন।

– রামপুত্র উদ্দক তাঁকে নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন লাভের ধ্যান প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং তিনি বোধিসত্ত্বের পঞ্চম আচার্য।

সম্যক সম্বুদ্ধ হবার পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বুদ্ধকে এই পাঁচজন আচার্য লৌকিক বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। লোকোত্তর সর্বজ্ঞাতা জ্ঞান প্রাপ্তিতে বুদ্ধের অনুত্তর শিক্ষাদাতা কেউ ছিলেন না।

আচার্য বিহীন স্বয়ম্ভূজ্ঞানে তিনি বুদ্ধ হয়েছেন। সেই কারণে বুদ্ধ বলেছেন:

"আমার আচার্য নাই নাই কেউ আমার সমান,
দেব-নর-লোকে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বিদ্যমান।"

কুশল ধর্ম

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে পুনর্জন্মের কথা জিজ্ঞাসা করলে ভদন্ত নাগসেন কুশল ধর্মের ব্যাখ্যা দেন। অভিধর্ম পিটকের অভ্যন্তরীণ চারটি বিষয় হলো: চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ। এখানে কুশলধর্ম বলতে চৈতসিককে বোঝানো হয়েছে। চিত্ত ও চৈতসিক এক নয় আবার ভিন্নও নয়। 'চিত্ত' বলতে যা চিন্তা করে তাই 'চিত্ত'। চিত্তের অপর নাম 'মন', 'অন্তকরণ', 'হৃদয়', 'বিজ্ঞান' প্রভৃতি। মনন, চিন্তন ও বিজানন্ই 'মন' বা 'চিত্তের' ধর্ম। চিত্ত সাধারণত ভাস্কর। চৈতসিক বা চিত্ত বৃত্তি সহযোগে এটা সংশ্লিষ্ট হয়। চৈতসিক মনের সাথে একত্রে উৎপন্ন হয়। আবার একসাথে নিরুদ্ধ হয়। এই চিত্ত বা চিত্তবৃত্তির সংখ্যা বায়ান্ন। এই বায়ান্ন প্রকার চৈতসিকই মনের সাথে যুক্ত হয়ে ঊনানব্বই (বা বিস্তৃতভাবে একশত একুশ) প্রকার চিত্ত উৎপত্তির কারণ হয়। এই চিত্ত ও চৈতসিকের মূল প্রকার হলো কুশল ধর্ম ও অকুশল ধর্ম। কুশল ধর্মের প্রভাবে প্রাণী তাঁর সকল লোভ, দ্বেষ,

মোহ ত্যাগ করে নির্বাণগামী হন। আয়ুষ্মান নাগসেন এই কুশলধর্ম বলতে মিলিন্দ প্রশ্নে শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধিকে বুঝিয়েছেন। যা অভিধর্মের মূলকথা ও বৌদ্ধদর্শনের মূল ভিত্তি।

শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধার পালি শব্দ হলো "সদ্ধা"। সাধারণত: শ্রদ্ধা বলতে– কোন কিছুর প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, আগ্রহ, চেতনাবোধ ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধা বলতে বুঝায়- ত্রিরত্নের প্রতি, কর্ম ও কর্মফলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। প্রখ্যাত দার্শনিক নার্গাজুন এর ভাষায়– "শ্রদ্ধা বুদ্ধের শাসন সমুদ্রে প্রবেশ পথ এবং জ্ঞান সেই সমুদ্র উত্তরণকারী জাহাজ।" শ্রদ্ধা চিত্তকে সংশয়মুক্ত রাখে ও সৎকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করে। এখানে শ্রদ্ধার সাথে ইন্দ্রিয়, বীজ, বল, সম্পদ, হস্ত, পাথেয় প্রভৃতির তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-বীজ, শ্রদ্ধা-বল, শ্রদ্ধা-সম্পদ, শ্রদ্ধা-হস্ত, শ্রদ্ধা-পাথেয়। রাজা মিলিন্দ শ্রদ্ধার লক্ষণ সম্পর্কে জানতে চাইলে আয়ুষ্মান শ্রদ্ধার লক্ষণ বিভিন্ন উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। মনের পবিত্রতা ও উচ্ছাকাঙ্খা জাগ্রত করাই শ্রদ্ধার পূর্ব লক্ষণ।

ভদন্ত নাগসেন শ্রদ্ধার লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন,- "সম্পসাদন লক্খনা চ মহারাজ সদ্ধা সম্পকখন্ধনস, লকখনাচা'তি।' অর্থাৎ, "মহারাজ! চিত্তের প্রসন্নতা সাধন ও উৎসাহ উৎপাদনই শ্রদ্ধার লক্ষণ।"

চিত্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে নীবরণ সমূহ বিদূরিত হয়। নীবরণ মুক্ত চিত্ত স্বচ্ছ, প্রসন্ন ও নির্মল হয়। এ রকম চিত্তের প্রসন্নতা সাধন শ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রদ্ধা মানব মনের সকল পাপ দূর করে সৎকর্ম সম্পাদনে উৎসাহী করে নির্বাণ লাভের ফল ভোগ করায়। উপমায় তিনি বলেন, "কর্দমাক্ত জলে জলশোধক বা জলপরিষ্কারক মণি নিক্ষেপ করলে সত্ত্বর সংখ, শৈবাল, পানা বিদূরিত হয় এবং কর্দম সরে যায়। জল স্বচ্ছ, পরিষ্কার ও প্রসন্ন হয়। চিত্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়াও জল শোধক মনির মত। চিত্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে পঞ্চ নীবরণ রাশি বিদূরিত হয়। পঞ্চ নীবরণ মুক্ত চিত্ত স্বচ্ছ, সুপ্রসন্ন, নির্মল ও অনাবিল হয়। এভাবে চিত্তের প্রসন্নতা সাধন শ্রদ্ধার লক্ষণ। আর উৎসাহ উৎপাদন শ্রদ্ধার লক্ষণ বলতে ভদন্ত নাগসেন বুঝিয়েছেন– কোন যোগী যখন অপর কোন সাধকের চিত্ত বিমুক্তি দেখে স্বয়ং শ্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী ফল কিংবা অর্হত্ত্ব ফলের জন্য আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হন এবং উদ্যোগ নেন অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির জন্য, অনুপলব্ধের উপলব্ধির জন, অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষের জন্য নিজেকে প্রযত্ন করেন, সাধনা করেন, আত্ম নিয়োগ করেন এবং পাবার জন্য উদ্যম হন। এভাবে মনে উৎসাহ সৃষ্টি শ্রদ্ধার লক্ষণ।

উপমায় তিনি বলেছেন,– পাহাড়ের উপর প্রবল বর্ষণ হলে সেই জল নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে পর্বতের গুহা, পাদদেশ, শাখা-নদী সমূহ পূর্ণ হয়ে অবশেষে নদীর দু'কূল প্লাবিত করে। এ দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে অনেক লোকের সমাগম হয়। তাঁদের অনেকেরই নদী পার হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নদীর গভীর ও অগভীর সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা বশত: ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে আর পার হয়নি। তাঁদের মধ্যে এক সাহসী, উৎসাহী ও শক্তিশালী ব্যক্তি নিজের শক্তি ও সাহস পর্যালোচনা করে দৃঢ়ভাবে কোমর বেঁধে নদীতে নামলেন এবং সাঁতার কেটে অপর পাড়ে যেতে সমর্থ হলেন। তাঁর এ সাহস ও উৎসাহ দেখে অন্যান্য লোকদেরও সাহস উৎপন্ন হল

এবং তাঁদের মনে উৎসাহভাব জাগ্রত হল। তারপর তারাও সাহসিকতার সাথে নদী পার হয়ে গেল। ঠিক তেমনিভাবে যোগী অপর কোন সাধকের চিত্তকে মুক্ত দেখে স্বয়ং সে পদ প্রাপ্তির জন্য প্রবল উৎসাহ লাভ করেন এবং সেইভাবে প্রার্থনা ও পরিশ্রম দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমর্থ হন। এভাবে মনে উৎসাহ সৃষ্টিই হচ্ছে শ্রদ্ধার লক্ষণ।

জীবন পথে নিয়ত এগিয়ে চলাই মানব ধর্ম। এ এগিয়ে চলতে গিয়ে মানবের যে সব গুণ প্রয়োজন তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধাই আদি। তাই তথাগত বুদ্ধের উক্তি,– "সকল প্রাণীই আত্মকৃত কুশল কর্মের ফলে সুখ এবং অকুশল কর্মের ফলে দুঃখ বোধ করে থাকে। তাই সুখকামী মানব শ্রদ্ধার সাথে অকুশল কর্ম বর্জন করে কুশল কর্ম সম্পাদন করা উচিৎ। সংযুক্ত নিকায়ে ভগবান বুদ্ধ আরো উল্লেখ করেছেন,

"সদ্ধায় তরতী ও ঘং অপ্পসাদেন অন্নবং,
বিরিয়েন দুক্খং অচ্চেতি, পঞ্ঞায় পরিসুজনতী' তি ॥"

অর্থাৎ "শ্রদ্ধা দ্বারা (দুঃখ) স্রোত ও অপ্রমাদ দ্বারা (সংসার) সাগর পার হওয়া যায়। বীর্য দ্বারা দুঃখ মুক্তি হয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা পরিশুদ্ধি লাভ হয়।"

বীর্য

মানব শরীরে বীর্যের প্রকাশ অপরিসীম। এই বীর্য ব্যতীত কেউ উচ্চতর জীবনে পৌঁছাতে পারে না। আর বীর্য ছাড়া সুকঠিন ব্রত সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, চিত্তকে কুশল ধর্মের অনুসারী করা এবং অকুশল ধর্ম থেকে বিরত রাখা কেবল বীর্য দ্বারাই সম্ভব। 'বীর্য' শব্দের অর্থ হল বীরত্ব, শৌর্য, কর্মশক্তি, শত্রুপরাক্রম, উদ্যম, উৎসাহ, প্রেরণা, প্রতাপ, সংকল্পবদ্ধতা প্রভৃতি। মানুষ চলার পথে অনেক বাধা আসে। সেই বাধা পরাক্রম ও উদ্যমের মাধ্যমে অতিক্রম করাই হচ্ছে বীর্য। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে এর নাম 'সম্যক ব্যায়াম'। এখানে বীর্যের স্থান ৬ষ্ঠ। সপ্ত বোজঝঙ্গে এর নাম "বিরিয় সম্বোজ সাঙ্গ"। ঋদ্ধি পদে এর নাম "বিরিয় ঋদ্ধি"। বীর্য দশ পারমীতার মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। বীর্যই সর্বপ্রকার ধারণ শক্তির প্রতীক। বীর্য মানুষকে অপ্রমত্ত হতে সহায়তা করে। এক কথায় কুশল কর্মের উৎসাহই 'বীর্য'।

বীর্য চৈতসিকই শাক্যমুনির চিত্তের উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তাই মহামতি বুদ্ধ 'চতুরঙ্গ বিরিয় সূত্রে' দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন,– "এ আসনে আমার শরীরের রক্ত-মাংস শুকিয়ে যাক, ত্বক, স্নায়ু ও অস্থি অবশিষ্ট থাক। যা পুরুষ শক্তিতে, পুরুষ বীর্যে ও পুরুষ পরাক্রমে প্রাপ্ততা; তা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার বীর্য (চেষ্টা) স্তব্ধ হবে না। অদম্য চেষ্টা লব্ধ আমার এ বোধি ও অনুত্তর যোগক্ষেম। ভিক্ষুগণ! তোমরাও অদম্যভাবে চেষ্টা করে সফলতা অর্জন কর। এ উপদেশ দ্বারা বুদ্ধ এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মুক্তিমার্গে উপনীত হওয়ার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা তাই 'বীর্য'।

মিলিন্দ প্রশ্নে রাজা মিলিন্দ আয়ুষ্মান নাগসেনকে বীর্যের লক্ষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তদুত্তরে ভদন্ত বলেছিলেন, "উপত্থুম্ভবন লকখ্নং বিরিয়ং উপসঙ্গামিত্তা সব্বে কুসলা ধম্ম ন পরিহানন্তী'তি।"

অর্থাৎ– "উপস্তম্ভ বা দৃঢ়ীকরণ বীর্যের লক্ষণ। বীর্য দ্বারা দৃঢ়ীকৃত যাবতীয় কুশল ধর্মের পরিহানী হয় না।"

উপমায় তিনি বলেছেন– "কোন ব্যক্তির স্বীয়ংগৃহ পতনোম্মুখ হলে অন্য কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা স্তম্ভ দিয়ে থাকে। যাতে করে গৃহ আর না পড়ে যায়। ঠিক তেমনি বীর্য দ্বারা দৃঢ়ীকৃত যাবতীয় কুশল ধর্মের পরিহানী হয় না।" তিনি আরো উপমা প্রদান করেছেন- অল্প সংখ্যক সেনাকে বহু সংখ্যক সেনা পরাজিত করেন। তখন পরাজিত রাজা এটা পর্যালোচনা করে আরো সৈন্য প্রেরণ করেন এবং স্বীয় অল্প সংখ্যক সৈন্যকে পিছন থেকে সাহায্য করেন। পরর্তীতে নিয়োগকৃত সৈন্য স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের মধ্যে যোগ দিলে সম্মিলিত সৈন্যের বড়রূপ ধারণা করে। সেই সম্মিলিত সৈন্য শত্রু সৈন্যকে পরাজিত করে। ঠিক একইভাবে বীর্যের প্রভাবে স্তম্ভের উপর স্থিত হয়ে কুশল ধর্ম হতে যোগী চ্যুত হয় না।

এই বীর্যই অঙ্গুলিমালকে নরঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং বীর্য বলেই তিনি কুশল পদপ্রাপ্ত হয়ে অর্হত্বে উন্নীত হয়েছেন। তাই বুদ্ধ বলেছেন-

"আরঙ্থ নিক্খাসাথ যুন্জ্জস বুদ্ধ সাসনে
ধুনাষ মাচ্ছুনো সেনাং নালাগারং বা কুঞ্জরো।"

অর্থাৎ আরম্ভ কর, প্রস্তুতি নাও, বের হয়ে পড় এবং বুদ্ধ শাসনে মন সংযোগ কর; বাঁশ বনে হস্তী যেমন প্রবেশ করে বাঁশগুলো চূর্ণ- বিচূর্ণ করে, তুমিও তেমন আপন তৃষ্ণা জালকে সমূলে ধ্বংস কর। এটা হবে তোমার চরম পুরস্কার।"

ধম্মপদে বলা হয়েছে-

"অত্তাহি অত্তনা নাথো, কো হি নাথো পরো সিয়া?" তাই যারা পরম প্রাপ্তির পক্ষে তাদের বীর্য চৈতসিকের অনুশীলন করা একান্ত অপরিহার্য। (ধম্মপদ–গাথা নং ১৬০)।

স্মৃতি

দৈহিক ও মানসিক সকল অবস্থায় সন্তর্পণে পর্যবেক্ষণ বা স্মরণই হলো 'সম্যক স্মৃতি'। এটি চিত্তকে কুশলে নিবিষ্ট রাখে, স্মৃতিহীন চিত্ত কর্ণধারহীন তরণীর মতো বিপন্ন। এজন্য স্মৃতিকে সর্বার্থসাধিকা বলা হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংস্পর্শে মোহ ও প্রমোদবশত তৃষ্ণার উৎপত্তি নিবারণে স্মৃতি সতর্কতা অবলম্বন করে দৌবারিকের কাজ করে।[২]

জীবন ও জাগতিক বস্তুর অনিত্যতা সম্পর্কে স্মরণ রেখে মনের ভিতর মিথ্যা ও পাপের কোনো স্মৃতি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সবসময় সচেষ্ট হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় অবচেতন মনে অনেক কু-প্রবৃত্তি ও কুটিল প্রেরণা দানা বেঁধে বসে থাকে। সুযোগ পেলেই এসব অশুদ্ধ ভাবধারা সচেতন মনে উত্থিত হয়। কিন্তু মন

যদি শুদ্ধ স্মৃতিতে পরিপূর্ণ থাকে, তবে কোন প্রকার পাপ প্রবৃত্তি সচেতন মনে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। আয়ুষ্মান নাগসেন স্মৃতির লক্ষণ বলেছেন দু'প্রকার। যথা:

পুনরাবৃত্তি স্মৃতি,

উপগ্রহণ স্মৃতি

পুনরাবৃত্তি স্মৃতি হলো কুশল-অকুশল, বর্জনীয়-অবর্জনীয়, হীন, প্রণীত, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বার বার স্মরণ করা। পুনরাবৃত্তি স্মৃতি আবার চার প্রকার। যথা:

চারমৃত্যুপস্থান,

চার সম্যক প্রধান (চেষ্টা),

চার ঋদ্ধিপাদ,

পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ।

উপমায় আয়ুষ্মান নাগসেন বলেছেন,- "কোন চক্রবর্তী রাজার ভান্ডাগারিক সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে রাজাকে তাঁর ঐশ্বর্যের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়, হে দেব! এতগুলো আপনার হাতী, এতগুলো আপনার অশ্ব, এতগুলো রথ, এতগুলো পদাতিক,এতগুলো রৌপ্য মুদ্রা, এতগুলো সুবর্ণ -এই পরিমাণ আপনার সম্পত্তি। ঠিক তেমনি পুনরাবৃত্তি স্মৃতি কুশল-অকুশল ধর্মসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয়- আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, বিদর্শন, বিদ্যা, বিমুক্তি। আর যোগী যখন সেবনীয় ধর্ম সেবন করে, অসেবনীয় ধর্ম সেবন করে না; ভজনীয় ধর্মের ভজনা করে, অভজনীয় ধর্মের ভজানা করে না, তখন তাকে বলে উপগ্রহণ স্মৃতির লক্ষণ।

উপমায় তিনি বলেছেন, চক্রবর্তী রাজার পরিনায়ক রত্ন যেমন রাজাকে হিতাহিত ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। কোনটি ঠিক, কোনটি ভুল, কোনটি উপকারী, কোনটি অনুপকারী। রাজা তদানুসারে কুশল ধর্ম পালন করেন, অকুশল ধর্ম ত্যাগ করেন। ঠিক একইভাবে যোগী হিতকর ধর্মগ্রহণ করেন এবং অহিতকর ধর্ম ত্যাগ করেন উপগ্রহণ স্মৃতির মাধ্যমে।

নির্বাণকামীর সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন কোনটা শরীরের কাজ এবং কোনটা মনের কাজ। উন্নত জীবন গঠনে সর্বদা স্মৃতির প্রয়োজন। এটা চিত্তের মোহ ও প্রসাদনকে অপসারিত করে।

প্রজ্ঞা

কুশল চিত্ত সম্প্রযুক্ত বিদর্শন জ্ঞানকে বৌদ্ধ মতে প্রজ্ঞা বলা হয়। চিত্তের পরিশোধন হলেই কেবল প্রজ্ঞা লাভ করা যায়। চিত্তের পরিশোধন মানে অন্তরের কাম, ক্রোধাদি রিপুদলের মূলোৎপাটনে চিত্তকে শুদ্ধ ক্লেশ শূন্য করা। তা সুস্পন্ন হয় কেবল প্রজ্ঞার অনুশীলনে। বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রজ্ঞার স্থান সর্বোচ্চ। প্রজ্ঞার উদয় হলেই মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। অন্ধ মানুষ যেমন পৃথিবীর সুন্দর-অসুন্দর কোন স্বরূপ জানতে পারে না, তেমনি প্রজ্ঞাহীন লোকের পক্ষে বুদ্ধের ধর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রজ্ঞা কুশল পক্ষে নিঃস্নেহ অনুরক্ত বিষয়ে সংলগ্ন। প্রজ্ঞা

যথাযথ দোষ অনুসন্ধান করে। দ্বেষ যেমন সত্ত্ব বা প্রাণীকে বর্জন করে, তেমনি প্রজ্ঞা বর্জন করে সংস্কারকে। প্রজ্ঞা ও দ্বেষের অসামঞ্জস্য বিদ্যমান বলে দ্বেষ চরিত্রের কুশল ক্রিয়া সম্পাদনে প্রজ্ঞা প্রবল হয়। বৌদ্ধধর্মে, পঞ্চস্কন্ধে দেহের উৎপত্তি বা জীবের জীবত্ব বিকাশ, দেবলোকে, মনুষ্যলোকে যেখানে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, জীবের জীবত্ব বিকাশকে বলে জন্ম বা জাতি। জন্ম হলেই দুঃখ, যেখানে দুঃখ সেখানে অনিত্য। এই দুঃখ, অনিত্য ও অনাত্মকে জানাই হচ্ছে প্রজ্ঞা।

রাজা মিলিন্দ প্রজ্ঞার লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আয়ুষ্মান নাগসেন প্রজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তিনি প্রজ্ঞার লক্ষণ বলতে ছেদন ও প্রকাশনকে বুঝিয়েছেন। প্রজ্ঞা চিত্তে উৎপন্ন হলে অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত হয়, বিদ্যারূপী আলো উদ্ভাসীত হয়, জ্ঞানালোক বিকশিত হয়, আর্য-সত্যসমূহ প্রকাশিত হয়। এরপর যোগী প্রজ্ঞাবলে 'অনিত্য', 'দুঃখ' ও 'অনাত্মা' সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও দর্শন লাভ করেন। উপমায় তিনি বলেছেন,যদি কোন ব্যক্তি অন্ধকার গৃহে প্রদীপ প্রবেশ করায়, প্রদীপ প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বিদূরিত হয়, আলোক বিকীর্ণ হয়, দ্রব্যসমূহ প্রকাশিত হয়। তেমনি প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত হয়। বিদ্যার আলো উৎপন্ন হয়, জ্ঞানালোক বিকিরণ করে, চার আর্য সত্য প্রকট করে। এরপর যোগী 'অনিত্য', 'দুঃখ' ও 'অনাত্মা' প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন করেন। আর এভাবেই প্রজ্ঞার লক্ষণ প্রকাশন ঘটে। অর্থাৎ বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে ক্লেশসমূহ (বাধা) ও আবরণসমূহ নির্মূল করে পরমার্থ জ্ঞান লাভ করে।

প্রজ্ঞা ভাবনার মাধ্যমে সাধক প্রথমে লৌকিক এবং পরে লোকুত্তর জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। এরপর বিমুক্তিপ্রদ নৈর্বাণিক সুখ লাভ করেন। লৌকিক অভিজ্ঞানে (অভিজ্ঞা) সাধকের চিত্ত হয় সমাহিত, পরিশুদ্ধ, প্রভাস্বর, উপক্লেশ মুক্ত, নির্মল, বশীভূত ও অচঞ্চল। লৌকিক জ্ঞানের ফলশ্রুতিতে সাধকের যোগবিভূতি (ঋদ্ধি), দিব্যশোত্র, ধাতু-জ্ঞান (দিব্যকর্ণ), পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান (অপরের চিত্ত পরিবর্তিত জ্ঞান), জাতিস্মর জ্ঞান (পূর্বজন্মের স্মৃতি জ্ঞান) এবং সত্ত্বগণের চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান (বিদ্যাচক্ষু) এ পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরিজ্ঞাত হয়। মূলত এসব হলো এক একটি মানবিক শক্তি। এর প্রভাবে দূর নিকট হয় এবং নিকটও দূর হয়। অল্প বেশি হয় এবং বেশিও অল্প হয়।[৩]

যোগী বা সাধকের এই লৌকিক জ্ঞান পরবর্তীতে স্মৃতি প্রস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে প্রজ্ঞা ভাবনায় হয়। অর্থাৎ দেশের স্বভাব ধর্মের যথাযথ অনুশীলন বিদর্শন ভাবনায় পর্যবসিত হয়। প্রজ্ঞা ভাবনা অন্তরের সকল ক্লেশসমূহকে নির্মূল করে। যাবতীয় রিপুদমনই এর কাজ। অগ্নির লেলিহান শিখা যেমন বায়ুবেগে আরো জ্বলে সমস্ত বনকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তেমনি প্রজ্ঞা ভাবনার অনুশীলনে মনের সকল রিপু বিধ্বস্ত হয়। প্রজ্ঞা ভাবনার দ্বারাই পরবর্তী ফলে লৌকিক জ্ঞানের অতীত অবিমিশ্র লোকুতর ফল-রস অনুভূত হয়। এখানে লোকুত্তর ফলরস বলতে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ-এ চার প্রকার আর্য পদ্গল মার্গানুসৃত ফল সমাপত্তিতে সমাহিত হয়ে অমৃতরস আস্বাদন বুঝায়। সাধক ক্রমশ বিদর্শনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে তাঁর চিত্ত নির্বাণকে অবলম্বন

করেই সমাহিত হয়।[৪] 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞার লক্ষণ সম্পর্কে আয়ুষ্মান নাগসেন যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

শীল

পালি 'সীল' বা বাংলা 'শীল' শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র বা স্বভাব। শীল মানে সদাচার, সংযম, নিয়ম-নীতি। তবে এর মধ্যে সংযম শব্দটি বেশি গ্রহণযোগ্য। বৌদ্ধধর্মে শীলের গুরুত্ব অপরিসীম। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযমই হলো শীল। শীল হচ্ছে আদি কল্যাণ। সুবিশুদ্ধ শীল বা শুদ্ধ চরিত্রই কুশল ধর্মের আদি। বস্তুত চারিত্রিক শুদ্ধবহি ধর্ম চর্যার ভিত্তি। চরিত্র শুদ্ধ, সুন্দর না হলে আধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয় না। পতিত জমি আবাদ করে সোনার ফসল ফলাতে হলে যেমন প্রথমেই আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার করতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের জন্য সর্বপ্রথম দুঃশীলতা, দুর্নীতি, বিদূরিত করে চরিত্র শোধন আবশ্যক। মহাকারুণিক বুদ্ধ তাঁর ধর্ম দেশনায় নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মে প্রমত্তের কোন স্থান নেই। প্রব্রজিত হোক বা গৃহী হোক, প্রত্যেকে শীল পালন করা একান্ত কর্তব্য, যেহেতু প্রাণী মাত্রই সুখের প্রত্যাশা করে। সেই সুখ কেবল শীল পালনের মধ্য দিয়েই লাভ করা যায়। শীল পালন ছাড়া জাগতিক সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। যে যত বেশি পরিমাণে নিখুঁত ভাবে শীল রক্ষা করবে, তিনি তত বেশি সুখের ভাগী হবেন। তদ্বেতু বুদ্ধ বলেছেন, যে যত বেশি শীল পালন করেন, শীল রক্ষাজনিত পূণ্য প্রভাবে দেবলোক প্রাপ্তি ঘটে, বিপুল ভোগসম্পদ লাভ হয়। সেজন্য বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করা একান্ত প্রয়োজন। মিলিন্দ প্রশ্নে শীলের লক্ষণ নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে: সমস্ত কুশল (সৎ) কর্মের প্রতিষ্ঠাই শীলের লক্ষণ। ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, স্মৃতি উপস্থান, সম্যক প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তি লাভের প্রতিষ্ঠাই শীলের লক্ষণ। শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বা সাধক শীলকে আশ্রয় করে, এর ওপর ভিত্তি করে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনার মাধ্যমে সৎকর্ম বৃদ্ধি করেন। এতে সমস্ত কুশল কর্মের পরিহানি হয় না।

উপমা প্রদান করে ভদন্ত নাগসেন বলেছেন, পৃথিবীকে আশ্রয় করে যেমন বীজ, গাছপালা বৃদ্ধি, বিস্তার ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি ব্যক্তি বা সাধক শীলকে আশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞারূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন।

এখানে আরো উপমা দিয়ে বলা হয়েছে যে, নগর শিল্পী নগর নির্মাণের মানসে প্রথমে যে স্থান পরিষ্কার করায়, খুঁটি, কন্টক অপসারণ করায় এবং ভূমি সমতল করায়, তারপর রাস্তা ও চৌরাস্তার নকশা তৈরি করে। তেমনি যোগী শীলকে আশ্রয় করে ভাবনা করেন। তদ্বেতু বুদ্ধ বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তি শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধি ও প্রজ্ঞার উন্নতি সাধন করেন। প্রতিমোক্ষের শীলরাশিই ধরণীর ন্যায় ভিক্ষুদের আধার, সৎকর্মে বৃদ্ধির মূল এবং শীল হচ্ছে বুদ্ধশাসনের মুখ স্বরূপ।[৫] বিনয় প্রতিষ্ঠা হলেই বুদ্ধশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। কায়, বাক্য ও মনের রুক্ষতা ও

কর্কশতা নিবারণ, উচ্ছৃঙ্খলতার অপসারণ, বধ-বন্ধন-প্রহার, আটক, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, পিশুনবাক্য, সম্প্রলাপ, পরুষবাক্য (কর্কশ), নেশাদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি থেকে বিরতিই শীলের কার্য।[৬]

শীল চরিত্র ও বারিত্র হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত। মহামানব গৌতম বুদ্ধ যা কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন তা চরিত্র এবং যা অকর্তব্য বলে নিষেধ করেছেন তা বারিত্র। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে শীলের উৎকর্ষ সাধনে হ্যাঁ বা না প্রয়োগ করা হয়েছে।[৭]

শীলকে মোটামুটি দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. পঞ্চশীল, ২. উপোসথশীল, অষ্টশীল, ৩. দশশীল, ৪. সমথ অষ্টশীল, ৫. সুচরিতশীল, ৬. প্রব্রজ্যা শীল, ৭. পটিজাগর উপোসথ শীল, ৮. পটিহারিয় উপসথ শীল, ৯. পরিশুদ্ধি শীল ও ১০. ধুতাঙ্গ শীল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শীল হলো পঞ্চশীল। পঞ্চশীল নিম্নরূপ:

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযানি।

৩. কামেসু মিচ্ছচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৫. সুরামেরেয় মজ্জপমদট্ঠনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ (১) আমি প্রাণি হত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(২) আমি অদত্তবস্তু (চুরি) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(৩) আমি মিথ্যাকামাচার পরস্ত্রী বা পরপুরুষে গমন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(৪) আমি মিথ্যা বাক্যকথন থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

(৫) আমি মত্ততার কারণ মদ,গাঁজা, নেশা-দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

এরকম ২২৭টি শীল ভিক্ষু জীবনে পালন করতে হয়। তবেই কেউ নির্বাণ লাভ অর্থাৎ পরম সুখ লাভ করতে পারে।

শীলের গুরুত্ব বলতে গিয়ে আচার্য বুদ্ধঘোষণ বলেছেন,

"সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো
চিত্তং পঞ্ঞঞ্চ ভাবযং,
আতাপী নিপকো ভিক্খু
সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি।"

অর্থাৎ "শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নর প্রজ্ঞাবান,
সমাধি আর বিদর্শন দুই করে ধ্যান,
বীর্যবান প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু সেই জন,
সেইজন এই জটা করছে ছেদন।"

সমাধি

সমাধি শব্দটি এসেছে 'সমাধা' শব্দ থেকে। যার উৎপত্তিগত অর্থ হলো সমাধান করা, একত্রিত করা, মনোনিবেশ করা। যা মনের একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে নির্দেশ করে। একই আলম্বন চিত্ত-চৈতসিকের সমান ও সম্যক প্রণিধানকে সমাধি বলে। এর ফলশ্রুতিতে চিত্ত ও চৈতসিক অবিক্ষিপ্ত ও অবিস্তীর্ণ হয়ে একই কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। বুদ্ধঘোষ চিত্ত এবং সমাধিকে একীভূত করে বিশ্লেষণ করেছেন।[৮] কুশল চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক সমাধি।

সমাধিকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা হয়: কৃৎস্ন বা কসিন সমাধি, উপাচার সমাধি ও অর্পণা সমাধি। কৃৎস্ন সমাধি অবিরাম ত্রুটিমুক্ত হয়ে উপস্থিত হয় সুচিত্তের কার্যকারিতায়। ধ্যানাবস্থায় ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অর্পণা সমাধি লাভ হয়। অর্পণা সমাধিই পরিপূর্ণ সমাধি যার জন্য প্রথম ধ্যানলাভ হয়। প্রথমটি স্বভাবত ক্ষণস্থায়ী, দ্বিতীয়টি সুদৃঢ় এবং তৃতীয়টি দীর্ঘস্থায়ী।[৯]

আয়ুষ্মান নাগসেন সমাধির লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন, "সমাধির লক্ষণ প্রমুখ (প্রধান)। যে সকল কুশল ধর্ম আছে, সেই সকল সমাধি-অভিমুখী, সমাধি-নিম্ন, সমাধি-প্রবণ এবং সমাধির প্রতি অবনত হয়।"[১০] যেমন কুটাগারের সব কুট বাঁকানো থাকে, সেই সব কুট শীর্ষগামী, নিম্নগামী হয়। কুট চারদিক থেকে আবার একত্রিত হয়। সে রকম যে সকল কুশল কর্ম আছে, সেসব সমাধি-প্রমুখ,সমাধি-নিম্ন, সমাধি প্রবণ এবং সমাধির প্রতি অবনত হয়।

তিনি আরো উপমা দেন। রাজা যখন চতুরঙ্গিনী সেনার সাথে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তখন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সকল সেনা তাঁর অভিমুখী হয়। রাজার প্রতি নত হয়, তৎপ্রবণ হয়। রাজার দিকে অবনত হয়। তেমনি সব কুশল কর্ম সমাধি প্রমুখ, সমাধি নিম্ন, সমাধি প্রবণ, সমাধির দিকে অবনত থাকে।

মূলত: যারা সমাধি বা চিত্তের একাগ্রতা করেন, তাঁরা কখনো দুঃশীল হতে পারেন না। তাঁরা সব সময় শান্ত, স্থির ও শীলসম্পন্ন হন। তাদের এই মহাগুণ ভাবনার সময়, তাদের জাগ্রত করে। তাদেরকে কুশল ধর্ম পালন করতে সাহায্য করে। চিত্তকে বিশুদ্ধি করবার জন্য সমাধি বা ভাবনার প্রয়োজন। মানব জীবনকে মহৎ ও সার্থক করতে হলে সমাধির বিকল্প নাই। প্রমত্ত বিক্ষিপ্ত বিচরণশীল চিত্তকে সংযত করতে না পারলে কোন কাজই সিদ্ধ হবে না। চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। একটি অবলম্বনে নিশ্চল অবস্থায় ধ্যান করতে হয়। সমাদি ধ্যানভেদে চার প্রকার: প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান। এ চারটি ভাবনা ক্রমোন্নতির স্তর। মূলত ভাবনা ও ধ্যান একই অর্থে প্রযোজ্য হয়। প্রথমটি প্রক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টি ফলোৎপত্তির স্তর। মনের বিক্ষিপ্ত ভাব ত্যাগ করাই সমাধি। একই আলম্বনে নিশ্চল অবস্থায় ধ্যান করতে হয়। ভাবনা হিসেবে সমাধি দুই প্রকার: সমথ ভাবনা ও বিদর্শন ভাবনা। আবার ধ্যানভেদে সমাধি চার ভাগে বিভক্ত:

১. সবির্তক, সবিচার, বিবেকজ, প্রীতিসুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান;

২. বিতর্ক, বিচার বর্জিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ সম্পন্ন সমাধিজ প্রীতিসুখ ও একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত দ্বিতীয় ধ্যান;

৩. সুখ-দুঃখ, সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য রহিত উপেক্ষা;

৪. স্মৃতি দ্বার পরিশুদ্ধি চিত্তযুক্ত চতুর্থ ধ্যান;

অসমাহিত বিক্ষিপ্ত চিত্তযুক্ত মানুষ জগতে কোন প্রকার উন্নতি সাধন করতে পারে না। সমাধি পরায়ণং অপ্রমত্ত ব্যক্তি জগতের সকল কাজে সফলতা লাভ করেন। শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমমূলে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে পরম বুদ্ধজ্ঞান লাভ করেন। প্রথম ধ্যানমগ্ন যোগীয় সকল প্রকার ভোগস্পৃহা ত্যাগ করা উচিত। কেননা, অত্যধিক ভোগস্পৃহা পরায়ণ চিত্ত সমাধিস্থ হয় না। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা চিত্তের এই পাঁচটি অবস্থা বিদ্যমান থাকে। দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক, বিচার উপশান্ত হয়ে চিত্ত স্থির হয়। যোগী এখানে চৈতসিক প্রসার লাভ করে। চিত্তে বলবতী শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তাঁর চিত্ত প্রীতিতে আপ্লুত হয়ে পড়ে। তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক, বিচার ও প্রীতির অবসান হয়। যোগী উপেক্ষাজনিত ভাব অনুভব করেন। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি আরো অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে তিনি শারীরিক সুখ-দুঃখ এবং মানসিক সৌ-মনস্য দৌমনস্য পরিহার করে চতুর্থ ধ্যানলাভী হয়ে বিহার করেন। চতুর্থ ধ্যান উপেক্ষার প্রাধান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই চতুর্থ ধ্যানিক চিত্তই পরমার্থ জ্ঞান লাভের উপযোগী।

দ্বাদশ নিদান

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ ও আয়ুষ্মান নাগসেনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ দর্শনের মূলতত্ত্ব দ্বাদশ নিদান বা প্রতিত্যসমুৎপাদ নীতি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি কাজের পিছনে কারণ রয়েছে। কারণ ছাড়া কোন কাজ সংঘটিত হয় না। বৌদ্ধ ধর্মে কার্যকারণ শৃঙ্খল এমন বারটি কারণ আছে, তাই একে দ্বাদশ নিদান বলা হয়। এই দ্বাদশ নিদানের অপর নাম 'ভবচক্র'। এদেরকে ভবচক্র বলার কারণ, এরাই মানুষকে জন্ম, দুঃখভোগ ও পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে বারংবার সংসারে চাকার মত ঘুরাচ্ছে। কারণ হতে কার্যের দিকে অগ্রসর হলে দ্বাদশ নিদানের সংক্ষিপ্ত রূপ দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

১. অবিদ্যা দুঃখের মূল কারণ; অবিদ্যা হতে

২. সংস্কার বা গত জীবনের পূর্বাভিজ্ঞতার ছাপ; সংস্কার হতে

৩. বিজ্ঞান বা চেতনা; চেতনা হতে

৪. নাম রূপ বা দেহ-মন সংগঠন; নামরূপ হতে

৫. ষড়ায়তন বা ষড়ইন্দ্রিয়; ষড়ায়তন হতে

৬. স্পর্শ; স্পর্শ হতে

৭. বেদনা বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা; বেদনা হতে

৮. তৃষ্ণা বা ভোগস্পৃহা; তৃষ্ণা হতে

৯. উপাদান বা জাগতিক বস্তুর সংযোগতা; উপাদান হতে

১০. ভব বা জন্মলাভেল তীব্র বাসনা; ভব হতে

১১. জাতি বা জন্ম; জাতি হতে

১২. জরা মরণ স্বরূপ দুঃখের উৎপত্তি।

নিম্নে মিলিন্দ প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

অবিদ্যা

অবিদ্যা হচ্ছে দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা কোন বিষয়ের যথার্থ স্বভাব জানতে দেয় না। বরঞ্চ এর বিপরীত বোধের সৃষ্টি করে। জীবন ক্ষণস্থায়ী। অথচ এ বিষয় কেউ চিন্তা করে না। করলেও পর মুহূর্তেই আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। অবিদ্যা আপন চক্রে বারবার ঘুরে।[১১] চিত্তে জ্ঞান উৎপন্ন হলে সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যা সম্পর্কে সকল মোহ নিরুদ্ধ হয়। আয়ুষ্মান নাগসেন উপমা প্রদান করে বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি অন্ধকার গৃহে প্রদীপ স্থাপন করে সেখান থেকে অন্ধকার নিরুদ্ধ হয়, আলোক প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি জ্ঞান বা বিদ্যা উৎপন্ন হওয়া মাত্র মোহ সেখান থেকে নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু অবিদ্যা হেতু প্রাণী বারবার জন্মগ্রহণ করে মহা দুঃখ ভোগ করে।

সংস্কার

অবিদ্যার কারণে সংস্কার উৎপন্ন হয়। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ যখন কোন বিষয় চিন্তা করে, কথা বলে তখন তার চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে নতুন ভাবের সৃষ্টি হয়। চিত্তের এ নতুন ভাব বা চেতনাকেই সংস্কার বলে। সংস্কার উৎপন্ন হয় কিনা এ প্রশ্নে ভদন্ত নাগসেন বলেন, চক্ষু ও রূপ থাকলে চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। চক্ষু বিজ্ঞান হতে চক্ষু সংস্পর্শ হয়, চক্ষু সংস্পর্শ হতে বেদনা (অনুভূতি) হয়, বেদনা হতে তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণা হতে উপাদান হয়, উপাদান হতে ভব (কর্ম) হয়, ভব হলে জন্ম হয়, জন্ম হলে জরা-মরণ-শোক-পরিবেদন-দুঃখ-দুশ্চিন্তা-হতাশা উৎপন্ন হয়। এভাবে কেবল দুঃখ পুঞ্জের উৎপত্তি হয়। এর একটি না থাকলে অন্যটি উৎপন্ন হবে না।

বিজ্ঞান

সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। মনের ভিতর সঞ্চিত সংস্কারের প্রভাবে নতুন করে নতুন কারণ উদ্ভব হয়। রূপের সাথে চক্ষু, শব্দের সাথে শ্রবণ, গন্ধের সাথে ঘ্রাণ, রসের সাথে জিহ্বা এবং ভাবের সাথে মন সম্মিলিত হয়, তখন বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে বিজ্ঞানের লক্ষণ বলতে বিশেষরূপে জানাকে বিজ্ঞানের লক্ষণ বলে। উপমায় বলা হয়েছে- যেমন নগরের নগর রক্ষক চৌরাস্তার মধ্যে বসে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতে আগত ব্যক্তিকে দর্শন করে, তেমনি লোকে চক্ষু দিয়ে যেভাবে দেখে তা বিজ্ঞান দিয়ে বিশেষভাবে জানে। তেমনি কান দিয়ে যেই শব্দ শুনে, নাক দিয়ে যেই গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দিয়ে যেই রস আস্বাদন করে, কায় দিয়ে সেই স্পৃশ্য স্পর্শ করে এবং মন দিয়ে যেই ধর্ম জানে তা বিজ্ঞান দিয়ে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়।

নামরূপ

বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ উৎপন্ন হয়। নাম বলতে সত্ত্বার সূক্ষ্ম বা মানসিক অংশ এবং রূপ বলতে স্থূল বা কায়িক অংশ বুঝায়। অর্থাৎ দেহ ও মনের সমন্বয়ে জীব। মন ছাড়া দেহ যেমন অচেতন পদার্থ, তেমনি দেহ ছাড়া মন অচেতন। মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হয়েছে, মানুষ এই নাম রূপ দিয়ে পাপ বা পুণ্য কর্ম করে। আবার সেই কর্মের জন্য অপর নামরূপ জন্মগ্রহণ করে। যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ না করে তবে সে পাপ কর্ম হতে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু যেহেতু সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে সেই জন্য পাপ কর্ম হতে মুক্ত নয়। আয়ুষ্মান নাগসেন এই নাম-রূপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিভিন্ন উপমা প্রয়োগ করেছেন। যেমন কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির আম চুরি করে। আমের মালিক তাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে বিচার চায়। তখন চোর ব্যক্তি যদি বলে সে তার আম চুরি করে নি। কারণ আমের মালিক যে এক আম রোপণ করেছে তা সে নেয় নি, সে অন্য এক আম নিয়েছে। সুতরাং শাস্তি হওয়া অনুচিত। কিন্তু তারপরও সে ব্যক্তি চুরির দায়ে অপরাধী হবে। কেননা পূর্ব আম-সন্ততি বর্তমান আমের মধ্যে রয়েছে। ঠিক একইভাবে মানুষ এই নাম ও রূপ দিয়ে পাপ কিংবা পুণ্য কর্ম করে। সেই কর্ম দিয়ে অন্য নাম-রূপ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

ষড়ায়তন

নামরূপের কারণে ষড়ায়তন উৎপন্ন হয়। ষড়ায়তন বলতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, কায় ও মনকে বুঝায়। নামরূপ বা চিত্ত তার বাহন দেহ উৎপন্ন হওয়ার সাথে তাদের কাজ করার জন্য ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। ষড়ায়তনের মধ্যে মন প্রধান। মনের সাহায্য ছাড়া মানুষের দেহ অকেজো হয়ে পড়ে। অর্থাৎ দেহ ও মন থাকলে ষড়ায়তন বিদ্যমান থাকবেই। মিলিন্দ প্রশ্নের উপমায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি প্রদীপ নিয়ে গিয়ে নিজের ছাদে উঠে ভোজন করছিল। সেই প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে কোন গাছ দগ্ধ করল। গাছ জ্বলতে জ্বলতে ঘরে আগুন লাগলো। এরপর তার আগুন সমগ্র গ্রাম জ্বালিয়ে দিল। গ্রামবাসীরা তাকে জিজ্ঞেস করল তুমি কেন আগুন লাগালে গ্রামে? সে বলল আমি গ্রামে আগুন জ্বালাই নি। কিন্তু তারপরও সেই ব্যক্তি আগুন জ্বালানোর দায়ে শাস্তি পাবে। ঠিক তেমনি নাম:রূপের কারণে ষড়ায়তন উৎপন্ন হয়। আর মন থাকে বলেই দেহ উৎপন্ন হয়। এই ষড়ায়তন হলো মুরগীর ডিমের মতো। যদি মুরগীর কলল (ডিমের শ্বেতাংশ) না হয়, তবে অন্ডও (কুসুম) হয় না। এখানে কলল ও অন্ড পরস্পর আশ্রিত। এক সঙ্গে উভয়ের উৎপত্তি হয়।

ফস্‌স বা স্পর্শ

স্পর্শ বলতে সংযোগ বা মিলনকে বুঝায়। স্পর্শ তখনই উৎপন্ন হয় যখন তা ষড়েন্দ্রিয় বস্তুর সংশ্রবে আসে। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগ থাকে। কেবল স্পর্শের মাধ্যমেই ঘটনাগুলোর অভিজ্ঞতার সঠিক ছাপ গ্রহণ করা যায়। সংশ্লিষ্ট বস্তু সমূহের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সাহায্য পাওয়া যায়। স্পর্শ ছাড়া যথাযথ সঠিক ধারণা লাভ করা যায় না। স্পর্শের লক্ষণ সম্পর্কে ভদন্ত নাগসেন বলেছেন, স্পর্শ করাই স্পর্শের লক্ষণ। উপমায় তিনি বলেছেন, দুই

ভেড়া যুদ্ধ করলে, তাদের এক ভেড়াকে চক্ষুর মতো আর অন্য ভেড়াকে রূপের মতো বুঝতে হবে। তা যেমন সংযোগ তেমনি স্পর্শকে মনে করতে হবে। তিনি আরো বলেন, কোন মানুষ যখন দুই হাতে তালি বাজায়, তখন এই দুই হাতের সংযোগতাই হলো স্পর্শ।

বেদনা বা অনুভূতি

স্পর্শ থেকে বেদনার সৃষ্টি হয়। অনুভূতি সংবেদন বেদনার লক্ষণ। কোন ব্যক্তি পূর্ণ কর্ম করে দেহ ত্যাগের পর সুগতি পরায়ণ হয়ে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সে সেখানে দিব্য পঞ্চকাম উপভোগ করে। তার মনে এরূপ চিন্তা হয় আমি পূর্বে পূণ্যকর্ম করেছি। সে কারণেই আমি এমন সুখ ভোগ করছি। এমন অনুভব ও সংবেদন বেদনার লক্ষণ।[১২] স্পর্শের কারণে বেদনা উৎপত্তি হয়। বেদনা তিন প্রকার: সুখবেদ, দু:খবেদনা ও উপেক্ষা বেদনা অর্থাৎ সুখও নয়, দু:খও নয়, ষড়েন্দ্রিয় ও স্পর্শ এ দুয়ের সংস্পর্শে সুখের হোক বা দু:খের হোক বেদনা উৎপন্ন হবেই।

তন্হা বা তৃষ্ণা (আসক্তি)

বেদনার কারণে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা দেখে যেমন কীট-পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, তেমনি জীব মাত্রই বেদনা বা রসানুভূতিতে আকৃষ্ট হয়ে তৃষ্ণার বশীভূত হয়। মন তার প্রদুষ্ট স্বভাব ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সহযোগে কামভোগের আসক্তি করে। মনের অবস্থার ওপর সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। তৃষ্ণাকে বলা হয় কামোপাদানের উপনিশ্রয়। রূপ, শব্দ, গন্ধাদি আলম্বনে তৃষ্ণা ক্রমশ পরিপাক হয়ে প্রবল
কামোপাদানরূপে পরিণত হয়।[১৩] তৃষ্ণা তিন প্রকার: কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা।

উপাদান

তৃষ্ণার কারণে উপাদান উৎপত্তি হয়। জীব যতই ভোগ করুক না কেন, তার তৃষ্ণা অপুর্ণই থেকে যায়। ঘৃতসিদ্ধ আগুনের মত আরো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। মনের উদ্যম ভাবই উপাদান। তৃষ্ণা যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখনই তা উপাদানে পরিণত হয়। উপাদান চার প্রকার: কাম উপাদান (ইন্দ্রিয় সম্ভোগ), দৃষ্টি উপাদান (মিথ্যা ধারণা), শীলব্রত উপাদান (আচার অনুষ্ঠানই সঠিক পথ) এবং আত্মবাদ-উপাদান (শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাস)।

ভব বা উৎপত্তি

উপাদানের কারণে ভবের উৎপত্তি হয়। হওয়ার আকাঙ্খায় কর্ম সম্পাদিত হয় এবং উৎপন্ন হয় বলে ভব। ভব দুই প্রকার: কর্ম ভব ও উৎপত্তি ভব। কুশল, অকুশল কর্ম, সংস্কার প্রভৃতি কর্মভব এবং কর্ম দ্বারা উৎপন্ন ভবই উৎপত্তি ভব। উপাদানই বর্তমান কর্মভব এবং পরজন্মই উৎপত্তি ভব। এটাকে বলা হয় জীবনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। মিলিন্দ প্রশ্নে উপমায় বলা হয়েছে, কাঠগুলো পূর্বে বনে ছিল, এই মাটি পৃথিবীতে ছিল, নর-নারীদের উদ্যমের ফলে এই গৃহ প্রস্তুত হয়েছে। তেমনি ভবের কারণে জন্ম নেওয়ার বাসনা হয়।

জাতি-জন্ম

ভবের কারণে জাতি বা জন্ম হয়। জন্ম বলতে মাতৃজঠরে উৎপত্তি বুঝায়। প্রতিসন্ধিক্ষণে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে 'নামরূপ' আখ্যায়িত হয়ে মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয়। কর্মভবই প্রতিসন্ধির বা উৎপত্তির কারণ। নদীর স্রোতের ন্যায় এ গতি চলতে থাকে। এ প্রবাহ কার্যকারণ নির্ভর। নদীর স্রোতের মতো এ গতি চলতে থাকে। এর মূলে রয়েছে কার্যকারণ তত্ত্ব। কারণ থাকার কারণে যেমন কার্য সংগঠিত, তেমনি নাম রূপের কারণে প্রাণী জন্ম গ্রহণ করে।

জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ

জন্ম গ্রহণ করলে অবশ্যই জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। জরা বা ব্যক্তি শারীরিক অভিব্যক্তি অনিত্য ও অসার বিধায় পরিণামে জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, বিষাদ, হতাশা প্রভৃতি আনয়ন করে। এটিও উৎপন্ন বশে ধারাবাহিকভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতির অন্তর্গত। অবিদ্যার কারণে দ্বাদশ নিদান বারবার ঘুরছে। এ কারণে মানুষকে বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এ দ্বাদশ নিদান তত্ত্ব বুদ্ধে অমর দান।

চার-আর্যসত্য

আর্য সত্য বা চার আর্য সত্য হচ্ছে বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব। এই আর্য সত্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় প্রাণী এই ভবচক্রে বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই বুদ্ধ সর্বপ্রথম যে ধর্ম সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট দেশনা করেছিলেন, তখন ভোগবিলাস ও কৃচ্ছ্রসাধন এ দুই অন্তবর্জিত যে পথের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা মূলত আর্যসত্য। এই আর্যসত্যই তাঁর ধর্মের মূল ভিত্তি। মহামানব গৌতম বুদ্ধ সব সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। নিম্নে চার-আর্যসত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(ক) প্রথম আর্যসত্য: দুঃখ আছে: এ জগতে সবই দুঃখময় ও দুঃখে পরিপূর্ণ। জন্ম, জরা, মরণ, শোক, উৎকণ্ঠা, আকাঙ্খা, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ- সবই দুঃখের। যাকে মানুষ আপাত সুখ মনে করে তাতেও দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। পৃথিবীতে যত প্রকার দুঃখ আছে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে বুদ্ধ ৮টি পর্যায়ভুক্ত করেছেন। যথা: জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং পঞ্চোপাদান স্কন্ধময় এ দেহ ও মন দুঃখময়। মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে জন্ম, মৃত্যু পর্যন্ত সবই দুঃখ। এবং আমৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে এই দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই দুঃখ হতে কোন প্রাণীর মুক্তি নেই। আট প্রকার দুঃখকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে– শারীরিক ও মানসিক দুঃখ। শারীরিক দুঃখ হলো জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু। মানসিক দুঃখ হচ্ছে প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি এবং পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে বেদনা উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ এবং বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ। মিলিন্দ প্রশ্নে আয়ুষ্মান নাগসেন বলেছেন, 'সংসারে থাকলে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করতে হবে।'

(খ) দ্বিতীয় আর্যসত্য : দুঃখের কারণ আছে: এই জগতে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি দুঃখের কারণ রয়েছে। এই সত্যটি স্বাভাবিক কার্যকারণ নিয়ম হতে নিঃসৃত। পৃথিবীতে কোন জিনিসই অকারণে উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে কারণ থাকে। আর সেই কারণেই জন্য কার্যের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দুঃখেরও কারণ আছে। এই জগতে দুঃখের মূল কারণ হলো তৃষ্ণা। মূলত তৃষ্ণাই সকল দুঃখের কারণ। তৃষ্ণা অনুরাগ সহগত হয়ে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শে আকৃষ্ট হয়। তৃষ্ণা তিন প্রকার: কাম (ভোগ) তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। ইন্দ্রিয়ের প্রিয় বস্তুই কাম। ঐ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক এবং ওর মননই তৃষ্ণার জনক- ভব। 'ভব' অর্থে উৎপত্তি, পুনর্জন্ম, জীবন কেও বোঝায়। বিভব বলতে তৃষ্ণার নিবৃত্তিকে বোঝায়, যাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এ সকল তৃষ্ণার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ তৃষ্ণা হলো কামতৃষ্ণা। কামের বশবর্তী হয়ে মানুষ এমন কোন কার্য নাই যা করে না। আয়ুষ্মান নাগসেন বলেছেন, "চক্ষু ও রূপ থাকলে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় চক্ষু-বিজ্ঞান হতে চক্ষু-সংস্পর্শ হয়, চক্ষু-সংস্পর্শ হতে বেদনা (অনুভূতি) হয়, বেদনা হতে তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণা হতে উপাদান হয়, উপাদান হতে ভব (কর্ম) হয়, ভব হলে জন্ম হয়, জন্ম হলে জরা-মরণ-শোক-পরিবেদন-দুঃখ-দুশ্চিন্তা-হতাশা উৎপন্ন হয়। আর এইভাবেই কেবল দুঃখপুঞ্জের উৎপত্তি হয়।"[১৪]

(গ) তৃতীয় আর্যসত্য: দুঃখের নিবৃত্তি আছে: দুঃখের যেমন কারণ আছে, তেমনি দু:খের নিবৃত্তি আছে। দুঃখের কারণের জন্য দুঃখ উদ্ভব হয়। অতএব এ কারণগুলো যদি সমূলে উৎপাটিত করা যায়, তাহলে দুঃখেরও অবসান ঘটে। মিলিন্দ প্রশ্নে উপমায় বলা হয়েছে- দৃঢ়মূলক শিকড় উৎপাটিত না হলে ছিন্ন বৃক্ষ পুনর্বার উজ্জীবিত হয়ে উঠে, তেমনি চিত্তে অনুশায়িত তৃষ্ণার সমুচ্ছেদ না হলে এ দুঃখময় জীবন পুনঃপুন উৎপন্ন হয়। সুতরাং জন্ম-মৃত্যুর মূল শিকড় হচ্ছে তৃষ্ণা। তৃষ্ণাকে সমূলে ধ্বংস করতে না পারলে দুঃখের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। তৃষ্ণার মূলে রয়েছে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। অবিদ্যা ধ্বংস হলেই প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। আর প্রজ্ঞা উৎপন্ন হলে যোগী নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন।

(ঘ) চতুর্থ আর্যসত্য ঃ দু:খ নিবৃত্তির মার্গ বা পথও আছে: পৃথিবীতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে; ঠিক তেমনি দুঃখ নিবৃত্তির মার্গ বা পথও আছে। মহামানব গৌতমবুদ্ধ দীর্ঘ ছয় বৎসর সাধনা করে এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বের করেছেন। কীভাবে মানুষ দুঃখের কারণগুলি বিনাশ বা ধ্বংস করতে পারে, কীভাবে মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারে; তার উপায়ের বা পথের নাম দিয়েছে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের নাম দেওয়া হয়েছে- মধ্যপন্থা। যেখানে অনাবশ্যক কৃচ্ছসাধন নেই বা অসংযত ভোগবিলাসও নেই। পালন করা হয়েছে মধ্যবর্তী এক পন্থা বা উপায়। যার মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভের এক সুনিশ্চিত উপায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্য দিয়ে মিলিন্দপ্রশ্নে বৌদ্ধদর্শনের তাত্ত্বিক বিষয় সমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গসমূহ হলো- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

মহামানব গৌতম বুদ্ধ দুঃখ মুক্তির যে পথের কথা বলেছেন তা বৌদ্ধ ধর্মে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। দুঃখ মুক্তির এই পথ বা মার্গ আটঅঙ্গ সমন্বিত বলে একে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। এই একমাত্র মার্গ যা আয়ত্ত করতে পারলেই মানুষের ইহজীবনে দুঃখের নিবৃত্তি হয় ও নির্বাণ সাক্ষাৎ হয়।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গসমূহ প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধিভেদে বিভক্ত করলে দাঁড়ায়:

(ক) প্রজ্ঞা (১) সম্যক দৃষ্টি

(২) সম্যক সংকল্প

(৩) সম্যক বাক্য

(খ) শীল (৪) সম্যক কর্ম

(৫) সম্যক জীবিকা

(গ) সমাধি (৬) সম্যক প্রচেষ্টা

(৭) সম্যক স্মৃতি

(৮) সম্যক সমাধি

(ক) প্রজ্ঞা

(১) সম্যক দৃষ্টি

চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হলো সম্যক দৃষ্টি। বুদ্ধের মতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই দুঃখের মূল কারণ। এই অবিদ্যা থেকে জগৎ ও জীবনের সম্পর্কে মানুষের মিথ্যা জ্ঞান জন্মে। এই মিথ্যা জ্ঞানের কারণে মানুষ পৃথিবীতে বার বার জন্মগ্রহণ করে মহা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছে। দুঃখ নিবৃত্তের জন্য প্রথমে সম্যক দৃষ্টির তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি (কার্য-কারণ নীতি), কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি এটি মোহ বা অবিদ্যাকে নির্মূল করে। সম্যক দৃষ্টি দু'প্রকার- লৌকিক ও লোকোত্তর। মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হয়েছে আর্যমার্গ ফল সংযুক্ত প্রজ্ঞাই লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। লৌকিক অর্থে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভাল মন্দ কর্মের যথার্থ জ্ঞানকে সম্যক দৃষ্টি বলে। অর্থাৎ যে সমস্ত লোক এখনও মার্গফল লাভ করেনি, এদের কর্ম ও কর্মফল বিশ্বাসই লৌকিক সম্যক দৃষ্টি। আর যারা মার্গফল লাভ করে স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী ও অনাগামী-এ তিন স্তরের ফলজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরা লোকুত্তর সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। মূলত সকল অবিদ্যা দূর করে নির্বাণ লাভ করা যায়।

(২) সম্যক সংকল্প

পার্থিব বস্তু সম্পর্কে আসক্তি, ভোগবিলাসিতা, হিংসা, রাগ ও দ্বেষ বর্জন করার দৃঢ় ইচ্ছাই সম্যক সংকল্প। বুদ্ধ বলেছেন- কেবল আর্যসত্যগুলো সম্পর্ক যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়, জ্ঞান অনুসারে কাজ করবার জন্য সংকল্পেরও প্রয়োজন। সংকল্প তিন প্রকার: নৈষক্রম্য সংকল্প, অব্যাপদ সংকল্প ও অবিহিংসা

সংকল্প। নৈষক্রম্য সংকল্প হলো সকল প্রকার ভোগ স্পৃহা ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনের ব্রত গ্রহণ করা। অব্যাপদ সংকল্প বলতে অসৎকর্ম ত্যাগ করে সৎ কর্ম চিন্তায় আত্মনিয়োগ করা। অবিহিংসা সংকল্প বলতে হিংসাভাব থেকে বিরত হয়ে সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও করুণা পরায়ণভাব। সকল প্রকার অশুভ ও অকুশল চিন্তা পরিত্যাগ করে চিত্তে মৈত্রী, করুণা, পরোপকার, সৎচিন্তা ও সদভাবনায় নিজেকে জাগ্রত করাই সম্যক সংকল্প।[১৫]

(৩) সম্যক বাক্য

দুঃখ জয়ের জন্য বাক সংযম অত্যাবশ্যক। মিথ্যা কথা, চুকলি, কটুকথা, অসার কথা, পরনিন্দা প্রভৃতি বর্জন করাই বাক সংযমের লক্ষণ। বুদ্ধ বলেন, কেবল সৎ সংকল্প গ্রহণ করলে মুক্তি আসবে না। সংকল্প অনুসারে কাজও করতে হবে। এজন্য প্রথমেই বাক্য সংযম প্রয়োজন। কারণ বাক্যের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্তিকামীর আত্মনিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয়। মিথ্যা কথা, চুকলি, অসার কথা, সত্য গোপন, পরনিন্দা, বৃথা গল্প সবকিছু বর্জন করতে হবে। এ সমস্ত জিনিস কখনো উপকারে আসে না। বরং তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। বাচনিক সংযমী ব্যক্তি চার প্রকার গুণে গুণান্বিত হন।

(ক) মিথ্যা কথা হতে বিরত আত্মহেতু পরহেতু সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলেন না। সত্যবাদী হয়ে অন্যেরও বিশ্বাসভাজন হন।

(খ) ভেদবাক্য হতে বিরত ব্যক্তি হিংসাবশত ও ভেদসৃষ্টির অকারণে অন্যদের মিত্র বা বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন।

(গ) পরুষ বা কর্কশবাক্য থেকে বিরত ব্যক্তির কথা শ্রুতিমধুর, নির্দোষ, কল্যাণজনক, জনপ্রিয় বলে তাকে সবাই সম্মান করেন।

(ঘ) যিনি প্রলাপ বা বৃথাবাক্য থেকে বিরত থাকেন তিনি 'সজ্জন' বলে আখ্যায়িত হন।

(৪) সম্যক কর্ম

মানুষের আচরণ হবে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ও সত্যভিত্তিক। তাই মুক্তিকামীকে প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, মাদকদ্রব্য পরিহার এ পঞ্চশীল আচরণ পালন করতে হবে।

সকল মুক্তিকামীকে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকতে হবে এবং স্বার্থবোধ ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে কাজ করতে হবে। নির্বাণকামী তার জীবনকে এমনভাবে গঠন ও পরিচালনা করবে যাতে তার পদচ্যুতির কোন আশঙ্কা না থাকে। মিলিন্দ প্রশ্নে আয়ুষ্মান নাগসেন কর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। কেননা প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। তাই মানুষ কর্মগুণে নির্বাণ লাভ করেন, আবার খারাপ কর্মের জন্য জন্ম-জন্মান্তরে মহাদুঃখ ভোগ করেন।

(৫) সম্যক জীবিকা

কোন ব্যক্তির জীবিকার উপর তার কর্মফল অনেকটা নির্ভর করে। জীবিকা হবে সৎ ও নির্দোষ। যে কোন পুরুষ বা নারী সদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। এমনকি প্রাণ রক্ষার জন্যও কোন রকম অসদুপায় অবলম্বন করবে না। প্রাণী, অস্ত্র, মাংস, বিষ ও নেশা জাতীয় ব্যবসা সদজীবন নয়।[১৬] ছলনা, বঞ্চনা, অত্যাচার, ব্যভিচার ও শোষনাদি সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করতে হবে। মিথ্যা কথা ও অন্যায় আচরণ বর্জন করে সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা মুক্তিকামীর কর্তব্য।

গ. সমাধি

(৬) সম্যক প্রচেষ্টা

মনে দৃঢ়মূল কুচিন্তার বিনাশ সাধন, নতুনভাবে মনে কুচিন্তার উৎপত্তি নিবারণ, মনে সৎ চিন্তা আনয়ন এবং সৎচিন্তাকে মনে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টাকে সম্যক প্রচেষ্টা বা ব্যায়াম বলা হয়। তাই মনকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখার জন্য চেষ্টা ও অনুশীলনের প্রয়োজন। সাধককে শত বাঁধা বিপত্তি অতিক্রমকরে নিজের সাধনায় নিয়োজিত হতে হবে। বোধিদ্রুম মূলে বোধিসত্ত্বের (বুদ্ধের পূর্বাবস্থা) দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় ছিল। এই অধ্যাবসায়ের গুণেই গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বীর্য হচ্ছে মানুষের জন্য স্তম্ভ সদৃশ।[১৭] মানুষ বা সাধক স্মৃতিভ্রষ্ট হলে বীর্য তাঁর গতি সঞ্চার করে। অল্প সংখ্যক সেনা বহুসংখ্যক সৈন্যের নিকট পরাজিত হচ্ছে দেখে রাজা আবার তাঁদের পেছনে সৈন্য পাঠালে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তেমনি বীর্য মৃতি উপধারক সম্যক প্রচেষ্টা চার প্রকার:

(১) অনুৎপন্ন অসৎকর্ম অনুৎপাদনের চেষ্টা,

(২) উৎপন্ন অসৎকর্ম বিনাশের উদ্যম,

(৩) অনুৎপন্ন সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা এবং

(৪) উৎপন্ন সৎকর্ম প্রবৃদ্ধির চেষ্টা।

(৭) সম্যক স্মৃতি

সম্যক স্মৃতি বলতে যথাযথ পর্যবেক্ষণ। দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার অবস্থা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ বা স্মরণই সম্যক স্মৃতি। এতে চিত্ত সৎকর্মে নিবিষ্ট থেকে সকল প্রকার পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে। সম্যক স্মৃতি চার প্রকার: কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন। মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হয়েছে স্মরণ ও উপগ্রহণ হচ্ছে স্মৃতির লক্ষণ।[১৮] সৎ চিন্তা, অসৎ চিন্তা, সৎকর্ম, অসৎকর্ম, দোষ, নির্দোষ, হীন, মধ্যম উত্তম কর্ম প্রভৃতি প্রত্যেকের স্মৃতিপথে উদিত হয়। যারা অসৎ তারা তা প্রকাশ করে না, আর যারা সৎ ব্যক্তি তারা তা নিজেরাই সংশোধন করেন। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' অনুসারে সাধক বা সঠিক ব্যক্তি যখন স্মৃতি করেন তখনই স্মরণ হয়, রাজার ভান্ডাগারিক সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর রাজভান্ডারে কত ঐশ্বর্য, ধনদৌলত আছে স্মরণ করিয়ে দেয়। তেমনি স্মৃতি সাধককেও

স্মরণ করিয়ে দেয়। উপগ্রহণ হচ্ছে উৎপদ্যমান স্মৃতি হিতাহিত ধর্মসমূহের প্রতি অন্বেষণ। এ সকল ধর্ম হিতকর না অহিতকর, উপগ্রহণ এ অর্থে উপকারক। সেনাগণ যেমন রাজাকে সবসময় সতর্ক করেন, তেমনি স্মৃতি উপগ্রহণ সব সময় সাধককে কুশল ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(৮) সম্যক সমাধি

চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধি বলা হয়। সম্যক সমাধি দ্বারা মনের বিক্ষেপণ ও চাঞ্চল্য দূর করা যায়। সম্যক সমাধি হচ্ছে অষ্টমার্গের শেষ স্তর এবং এর মাধ্যমে চরম মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করা হয়। সমাধির চারটি স্তরের কথা 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে পাই। প্রথম স্তরে মুক্তি সাধক স্থির ও শান্ত মনে চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে বিতর্ক ও বিচার করবেন। এতে সাধক অনাসক্ত ও শুদ্ধ চিন্তাজাত আনন্দ অনুভব করেন। প্রথম স্তরের ধ্যানের ফলে সাধকের মনে চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যখন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে তখন সঠিক জীবন প্রবাহের মধ্যে এদের সন্ধান মিলবে। তাই বুদ্ধ বলেছেন- শয়ন, উপবেশন, গমন ও দন্ডায়মান যখন যেই অবস্থাতেই তোমাদের অন্তরে কলুষ ভাবের সঞ্চার হয়- তাকে সে অবস্থাতেই শান্ত কর, নিগ্রহ কর, সমুচ্ছেদ কর, অবস্থান্তরে যেতে দিও না।[১৯] আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলে মানুষের অন্তর জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হবে। এর মধ্য দিয়ে চরিত্র নির্মল হবে এবং সাধনা সিদ্ধ হবে।

স্বপ্ন

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ ও আয়ুষ্মান নাগসেনের কথোপকথনের মাধ্যমে স্বপ্ন তত্ত্ব বা স্বপ্ন দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পৃথিবীতে সকল প্রকার নর-নারী স্বপ্ন দেখে থাকে। ভাল ও মন্দ, পূর্বে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, পূর্বে কৃত ও অকৃত, শান্তিপ্রদ ও ভয়সঙ্কুল, দূরের বিষয় ও নিকটের বিষয় এমন সহস্র রকমের স্বপ্ন দেখে থাকে। এই স্বপ্ন নিমিত্ত মাত্র, যা চিত্তের গোচরে উপনীত হয়। আয়ুষ্মান নাগসেন ছয় প্রকার কারণের জন্য স্বপ্ন দেখার কথা বলেছেন-

"ছ ইমে মহারাজ, সুপিনং পসসন্তি, বাতিকো সুপিনং পস্সতি, পিত্তিকো সুপিনং পসসতি। সেমহিকো সুপিনং পস্সতি, দেবতুপাসংহারতো সুপিনং পস্সতি। সমুদাচিন্নতো সুপিনং পস্সতি, পুব্বনিমিতো সুপিনং পস্সতি।" অর্থাৎ-

(১) বায়ুর প্রকোপে স্বপ্ন দেখা যায়;

(২) পিত্তের প্রকোপে স্বপ্ন দেখা যায়;

(৩) শ্লেষ্মার প্রকোপে স্বপ্ন দেখা যায়;

(৪) দেবতার প্রভাবে কিছু স্বপ্ন দেখা যায়;

(৫) কোন কাজ বার বার করার অভ্যাস থাকলে তা স্বপ্নে দেখা;

(৬) পূর্ব নিমিত্ত বা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কোন বিষয় সম্পর্কে কখনও কখনও স্বপ্ন দেখা যায়।

এর মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কোন বিষয় সম্পর্কে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাই সত্য, বাকিগুলো মিথ্যা স্বপ্ন।

পূর্ব নিমিত্তরূপে যে স্বপ্ন দেখা যায় তখন তার চিত্ত স্বয়ং বাইরে গিয়ে সেই ঘটনাগুলো সঞ্চয় করে, না সে নিমিত্ত নিজে তার চিত্তের গোচরে আসে? কিংবা অন্য কেউ নিয়ে এসে তাকে বলে? এ প্রশ্নের জবাবে আয়ুষ্মান নাগসেন উপমায় বলেছেন- দর্পণ যেমন স্বয়ং কোথাও গিয়ে ছবি করে না আর অন্য কেউ কোন ছবি এনে দর্পণে আরোপ করে না। অথচ যে কোন স্থান হতে ছবি এসে দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। এই রকম চিত্ত স্বয়ং বাইরে গিয়ে সেই নিমিত্ত চয়ন করে না, আর অন্য কেউ এসে তাকে বলে না। অথচ যে কোন স্থান থেকে নিমিত্ত এসে তার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়। চিত্ত যখন স্বপ্ন দেখে তখন চিত্ত জানতে পারে না এর ফল অশুভ না শুভ হবে। কিন্তু যে এমন স্বপ্ন দেখে সে অন্য লোককে বলে থাকে এবং তার অর্থ প্রকাশ করে। মানুষের শরীরে তিল, ফোঁড়া বা দাদ উঠে থাকে। এগুলো তাদের লাভের জন্য বা অলাভের জন্য, যশের জন্য বা অযশের জন্য, নিন্দার জন্য বা প্রশংসার জন্য, সুখের জন্য বা দুঃখের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু সেই তিল সমূহ জানে না যে তারা এই প্রকার ফল উৎপাদন করবে। কিন্তু শরীরের যেই স্থানে তিল উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে তিল দেখে সে অনুযায়ী বিচার করে জ্যোতিষীরা প্রকাশ করেন- 'এর এরূপ ফল ফলবে'। তেমনি যে চিত্ত স্বপ্ন দেখে, সেই চিত্ত জানে না, তার কি রকম ভয়প্রদ বা শান্তিজনক ফল হবে। কিন্তু স্বপ্নের নিমিত্ত উপস্থিত থাকলে তা অন্যকে বলা হয়, তারপর তা তার অর্থের প্রকাশ করে থাকে। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন সে সুষুপ্ত অবস্থায় দেখে না, আর জাগ্রত অবস্থায়ও দেখে না। কিন্তু তন্দ্রাবেশের পর চিত্ত ভবাঙ্গে উপনীত হবার পূর্বে অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্বে এই সময়ের মধ্যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। গাঢ় নিদ্রাভিভূতের চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত বা বিমৃত হয়। ভবাঙ্গগত চিত্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারে কাজ করে না। চিত্ত কর্মক্ষম না থাকলে সুখ-দুঃখ জানা যায় না। যখন চিত্ত কিছু জানে না তখন স্বপ্ন দর্শন করা হয়। মনোদ্বারের চিত্ত সচল থাকলে তখনই স্বপ্ন দর্শন হয়। ঘনান্ধকারে স্বচ্ছ দর্পণেও প্রতিবিম্ব পড়ে না। আকাশে যখন আলোকিত থাকে না তখন ছায়া দেখা যায় না। তেমনি গাঢ় নিদ্রাভিভূতের চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হলে শরীর বিদ্যমান সত্ত্বেও পঞ্চদ্বার সম্পর্কিত চিত্ত কাজ করে না। যখন চিত্ত কর্মক্ষম থাকে না তখন স্বপ্ন দর্শনও হয় না। শরীরকে দর্পণের মতো আর নিদ্রাকে অন্ধকারের মতো এবং চিত্তকে আলোকের মতো মনে করতে হবে। গাঢ় কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যের প্রভা দেখা যায় না, সূর্যের রশ্মি নিস্প্রভ হয়। সূর্যরশ্মি নিস্প্রভ হলে আলো উদ্ভাসিত হয় না। এ রকম গাঢ় নিদ্রাভিভূতের চিত্ত ভবাঙ্গগত বা সুষুপ্তিতে নিমজ্জিত হয়, ভবাঙ্গগত চিত্ত কর্মক্ষম থাকে না। চিত্ত প্রবর্তিত হলে স্বপ্নদর্শন হয় না। এখানে শরীরকে সূর্যের মতো, গাঢ় নিদ্রাকে কুয়াশার মতো আর চিত্তকে সূর্যকিরণের মতো দেখতে হবে।

শরীর বিদ্যমান থাকলেও দুই অবস্থায় চিত্ত কর্মক্ষম থাকে না :

(১) গাঢ় নিদ্রাভিভূতের শরীর থাকলেও চিত্তপ্রবাহ অচল হয়। আর (২) নিরোধধ্যান সমাপন্ন অবস্থায় যোগীর শরীর বিদ্যমান থাকলেও চিত্তপ্রবাহ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়। জাগ্রত অবস্থায় চিত্ত চঞ্চল, বিব্রত, প্রকট ও অবিনিষ্ট হয়ে থাকে। এই অবস্থায় চিত্তে কোন নিমিত্ত প্রতিফলিত হয় না।

রহস্যকামীরা যেমন বিব্রত, প্রকট, নিষ্ক্রিয় ও রহস্যাবৃত লোককে পরিবর্জন করে, তেমনি জাগ্রত অবস্থায় দিব্য উদ্দেশ্য গোচরীভূত হয় না। সেই কারণে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন হয় না। জীবিকাভ্রষ্ট, দুরাচারী, পাপমিত্র, দুঃশীল, অলস, হীনবীর্য ভিক্ষুর কাছে কুশল বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ প্রতিভাত হয় না, তেমন জাগ্রত অবস্থায় দিব্য উদ্দেশ্যে গোচরীভূত হয় না। এই কারণে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন সম্ভব নয়। নিদ্রার আদি, মধ্য ও অন্ত রয়েছে। দেহের যে অবসাদ, অবসন্নতা, দুর্বলতা, মন্দতা ও অকর্মণ্যভাব প্রভৃতি মনে হয় তা নিদ্রার আদি। বানরের তন্দ্রাবেশের অনুরূপ (অর্ধ জাগ্রত ও অর্ধ সুপ্ত) যে তন্দ্রাবেশ হয়, তা নিদ্রার মধ্য। আর চিত্তের যে ভবাঙ্গগতি বা সুষুপ্তি অবস্থা তা নিদ্রার অন্ত। এদের মধ্যে যে মধ্য অবস্থা তাতে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। যেমন কোন সংযতচারী, সমাহিতচিত্ত, ধার্মিক, স্থিরবুদ্ধি যোগী কোলাহল বিহীন অরণ্যে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম ও গভীর বিষয় অনুসন্ধান করেন, সেখানে নিদ্রাভিভূত হন, সেখানে তিনি সমাধিপরায়ণ ও একাগ্রচিত্ত হয়ে গভীর সমস্যার সমাধান করেন। তেমনি জাগ্রত ও গাঢ় নিদ্রার মধ্য অবস্থাতে তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন হয়।

বৌদ্ধ অনাত্মবাদ

আত্মা সম্পর্কে প্রায় সকল ধর্মে দেহাতিরিক্ত চৈতন্যময় এক শাশ্বত সত্তাকে বুঝানো হলেও বৌদ্ধ ধর্মে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। মহামানব গৌতম বুদ্ধই সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে এমন শাশ্বত ও চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। অন্যদিকে বৌদ্ধ দর্শনেও দেহকেও আত্মা বলতে চান না। বুদ্ধের মতে এ জগতের সবকিছুই যখন ক্ষণিক ও অনিত্য। তখন কোন স্থায়ী ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। অনিত্যবাদ তত্ত্বে জগতের সবকিছু ক্ষণিক ও অনিত্য এবং নিয়ত সবকিছু পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তন প্রকৃতি ও জড় পদার্থের মধ্যে সহজে দৃশ্যগোচর হয়। বুদ্ধ এ বিষয়ে আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন, এ পরিবর্তনের নিয়ম প্রাণীর অন্ত:শরীরেও বিদ্যমান। দেহ ও মন নিয়ে জীব- এ নিয়ম শুধু শরীরের উপর কার্যকর, মনের উপর নয়, তা হতে পারে না। এ চিরসত্য পরিবর্তন নিয়মের উপর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বুদ্ধের অনাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত। পরিবর্তন যখন প্রকৃতি তথা জগতের ধর্ম, তখন পৃথিবীতে এমন কিছু থাকতে পারে না, যা পরিবর্তনশীল নয়। প্রতিটি জীবন নাম-রূপের সমষ্টি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান- এ চারটি একযোগে নাম এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু -এ চার পদার্থের সমন্বয়ে রূপ বা দেহ এবং এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিই জীবন। এর মধ্যে কোন একটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং দৃশ্যরূপ ব্যতীত অদৃশ্য নামের অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব নয়। শরীরে অবস্থানরত এর অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র আত্মা থাকতে পারে না। ঘরের ছাদ, দেয়াল, দরজা ইত্যাদি নিয়ে যেমন আমরা ঘর নাম দিয়ে থাকি, তেমনি পঞ্চস্কন্ধের মিলনকে আমরা 'আমি' বলি। সপ্তবর্ণের একত্র সংযোগে যেমন সাদা রঙের সৃষ্টি করে

পঞ্চস্কন্ধ মিলনজাত আত্মাও তেমন। ভদন্ত নাগসেন রাজা মিলিন্দকে এ স্কন্ধজাত মানুষের কথা বুঝানোর জন্য একটা রথের উপমা দিয়েছেন। একটি রথ যেমন এর চাকা, দণ্ড বা তার চূড়া প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের সমষ্টি এবং যে কোনো একটি অংশকে যেমন রথ বলা যায় না। তেমনি মানুষও পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি এবং যে কোনো একটি স্কন্ধকে এক মানুষ বলা যাবে না। রথের বিভিন্ন অংশের সমষ্টি বা সমন্বয় নষ্ট হলে যেমন রথের অস্তিত্ব বিলোপ হয়, তেমনি পঞ্চস্কন্ধের সুসমন্বয় বা বিন্যাস বিনষ্ট হলে মানুষও বিনষ্ট হয়। মানুষের পাঁচটি স্কন্ধের মধ্যে রূপ (দেহ) হলো বাহ্যিক স্কন্ধ আর বাকি চারটি হলো নাম বা মানসিক স্কন্ধ। বুদ্ধের এই পঞ্চস্কন্ধের ধারণায় দেহ ও মনের পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে এবং এ ধারণার সঙ্গে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণার সামঞ্জস্য রয়েছে।

বুদ্ধ সত্তার অভ্যন্তরে অভিরাম চেতনা প্রবাহ লক্ষ্য করেছেন। মানুষের মধ্যে নানা রকমের সুখ, দুঃখ, অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছা অহরহ আসা-যাওয়া করছে। সুতরাং প্রাণীর অভ্যন্তরে যে মানসিক প্রক্রিয়াগুলো দেখা যায়– তা একটির পরে একটি অবিরাম গতিতে প্রবাহিত, যা ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী হয়। চেতনার এই অবিরাম প্রবাহের অন্তরালে কোনো শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব নেই। তবে বহমান নদীর স্রোতধারার মতো অথবা অগ্নিশিখার মতো প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিক প্রবাহকে যদি কেউ আত্মা বলতে চায় তবে বলতে পারে। শিষ্যদের উপদেশ দেয়াকালে বুদ্ধ কখন কখনও 'আত্মা দ্বীপ হও', 'আত্মাই আত্মার নাথ' 'আত্মাই আত্মার নাম', 'আত্মাকে রক্ষা কর' ইত্যাদি কথা বলেছেন। তিনি এক্ষেত্রে 'আত্মা' শব্দের 'Soul' কে না বুঝিয়ে Self কে বুঝিয়েছেন। চৈতন্য প্রবাহের পশ্চাতে একটি পৃথক শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্তা অর্থে বুদ্ধ 'আত্মা' শব্দ ব্যবহার করেন নি। নাগসেন কে? রাজা মিলিন্দের প্রশ্নে আয়ুষ্মান নাগসেন এখানে বলেছেন, "নাগসেন কোনো প্রাণী নয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর বাহির সর্বত্র কোথাও নাগসেন নামী কেউ নেই। নাগসেন একটা প্রতীতি, পঞ্চস্কন্ধ সমন্বয়ে গঠিত দেহকে ব্যবহারের সুবিধার্থে একটা নামমাত্র।" এ স্কন্ধসমষ্টিও স্থির নয়, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে অগ্নিশিখার মতো, জলপ্রবাহের মতো। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত বিভিন্ন অবস্থাকে বিভিন্ন নাম দিতে পারি না বলেই এ প্রবাহের বিভিন্নতাকে আমরা একটা অভিন্ন নাম দিয়ে ব্যবহার করি। তাই আমাদের ভ্রান্ত ধারণা হয় ধারাবাহিকতার পশ্চাতে একটা স্থায়ী সত্তা আছে। আসলে তা নয়। ইংরেজিতে যখন আমরা It rains বলি তখন It বলতে কিছু নেই, শুধু Raining টাই আসল। তেমনি যখন বলি নাগসেন চিন্তা করছে, তখন চিন্তাটাই সত্য, নাগসেন বলতে কিছুই নেই। নাগসেন একটা নাম মাত্র। সুতরাং সত্তার কোনোখানে আত্মা নামে কিছু নেই। বস্তু জগতে অবিরাম পরিবর্তনশীলতা সব সময় সর্বাবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে চলছে- এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। বুদ্ধ এর আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করেন এ অবিরাম প্রবাহমানতা চৈতন্য রাজ্যেও বিরাজমান।

বৌদ্ধধর্মে অনাত্মবাদের মূল কথা হলো জীবের মধ্যে কোনো শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব নেই; তবে তাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। প্রতিটি পুর্ববর্তী অবস্থা পরবর্তী অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে। জীবনের এ ধারাবাহিকতার মূলে রয়েছে কার্যকারণ সম্বন্ধ যা বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটি যোগসূত্র রক্ষা করে

চলেছে এবং এজন্যই সত্তাটি তার সারাজীবন নিজেকে অভিন্ন সত্তা বলে উপলব্ধি করে। 'মিলিন্দ প্রশ্নে' একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হয়েছে, যেমন একটি প্রদীপ সারারাত জ্বলছে; যদিও প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা প্রদীপের একটি মাত্র শিখাই দেখছি। কিন্তু পূর্ব-মুহুর্তের শিখা আর পর মুহুর্তের শিখা এক নয়। অথচ প্রতি মুহুর্তেই প্রদীপের সলতে ও তেলের ভিন্নাংশ জ্বলছে, তবুও আমরা একটিমাত্র প্রদীপ শিখাই দেখছি। যে কোনো মুহুর্তের অগ্নিশিখা অন্য মুহুর্তের অগ্নিশিখা হতে পৃথক, তবে এরা কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। প্রতি মুহুর্তের অগ্নিশিখা এর পরবর্তী শিখাকে সৃষ্টি করে শিখাগুলির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধারার সৃষ্টি করেছে। অনুরূপভাবে আমাদের জীবন প্রদীপের প্রতিটি মুহুর্ত ভিন্ন হলেও সারাটা জীবনের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। জীব জগতের জড় ও চেতন এ দু'অংশের মধ্যে নিত্য নির্বিকার চির শাশ্বত কোনো পদার্থই এখন পর্যন্ত কোনো জীববিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে আবিস্কৃত হয় নি। যাকে আমরা আত্মা বলে মনে করি। যা জন্ম নিচ্ছে, মরছে- তা এক সন্ততি (Flux) বিশেষ। যার অঙ্গ সমূহের মধ্যে হেতুফল সম্বন্ধ বিদ্যমান। যাঁরা শাশ্বত আত্মার কথা বলেন তাঁরা হয়ত পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিকে অথবা যে কোনো একটি স্কন্ধকে আত্মা বলে থাকেন। কারণ শরীরকে বিজ্ঞানীদের মতো বিশ্লেষণ করলে এতে অন্য কোনো স্থায়ী পদার্থ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধমতে শরীরকে আত্মা মনে করা যেমন মূঢ়তা তেমনি শরীর হতে ভিন্ন নিত্য আত্মা স্বীকার করাও মূঢ়তা। বুদ্ধ বলেছেন, বাসনাজালই আত্ম আত্মীয়ভাবের কারণ, আত্ম-আত্মীয় ভাবই সমস্ত দুঃখের মূল। যতদিন মানব মন হতে এ ভ্রান্ত ধারণার বিলোপ হবে না, ততদিন প্রকৃত দুঃখমুক্তি অর্থাৎ নির্বাণ লাভ অসম্ভব।

প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা

বৌদ্ধ ধর্মে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৌদ্ধসংঘ প্রতিষ্ঠাকালীন অর্থাৎ শুরুতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কোন লোক ভিক্ষু সংঘে যোগদান করতে আসলেই বুদ্ধ তাকে 'এস ভিক্ষু' বলে সংঘভুক্ত করে নিতেন। বুদ্ধ তাকে ঐভাবে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে ঋদ্ধিময় পত্র চীবর তার শরীরে আবির্ভূত হত। তিনি শত বর্ষীয় মহাস্থবিরের মত প্রতীয়মান হতেন। প্রব্রজ্যা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকলে বুদ্ধের একার পক্ষে প্রত্যেক উপসম্পদা কার্যে যোগদান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সর্বপ্রথম রাহুল কুমারের প্রব্রজ্যা উপলক্ষ্যে বুদ্ধ সারিপুত্র স্থবিরের উপর রাহুল কুমারের প্রব্রজ্যার ভার অর্পণ করেন। সারিপুত্র তাকে ত্রিশরণ আবৃত্তি করে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। এর অব্যবহিত পরে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার জন্য নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। এই দু'টি উৎসব পৃথক পৃথক উৎসবরূপে পরিগণিত হয়। একটির নাম হয় 'শ্রামণের প্রব্রজ্যা' এবং অপরটির নাম হয় 'ভিক্খু উপসম্পদা'।

'মিলিন্দ প্রশ্নে' প্রব্রজ্যার অর্থ করা হয়েছে 'পাপকানং মলং পব্বজিতো' তি পব্বজিতো"।

নিজের পাপমল প্রক্ষালন বা ত্যাগ করার নামই প্রব্রজ্যা। বৌদ্ধদেব কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা অতীব স্মরণীয় ঘটনা। তাদের কাছে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মঙ্গল কর্ম আর নাই। জ্ঞানীদের মতে সংসার একটি আবর্ত বিশেষ। এই

আবর্তে পতিত হলে মানুষের নিস্কৃতি লাভ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। মানুষ, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতির সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে অভাব অনটনের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকে। এতএব এই সমস্ত কারণে সংসার কারাগার সদৃশ্য এবং অনাগারিক ভিক্ষু জীবন উন্মুক্ত আকাশের সাথে তুলনীয়। স্ত্রী-পুত্র পরিবার ত্যাগ করে অনাগারিক সন্ন্যাস জীবন অবলম্বনের নাম প্রব্রজ্যা। সংসারের বিষাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। মানব সভ্যতার আদিকাল হতে যে সকল মনীষী সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে বিভিন্ন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের মধ্যে তথাগত বুদ্ধের অবদান চিরস্মরণীয়। তিনি ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, রাজ্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে নিবৃত্তির সন্ধানে প্রব্রজ্যা জীবন অবলম্বন করেন। পৃথিবীর সকল মানুষের মুক্তির পথ আবিষ্কার করেন। প্রব্রজ্যা প্রার্থী ব্যক্তি প্রথমে কেশ, শ্মশ্রু ছেদন করে ভিক্ষুদের ব্যবহার্য সংঘাটি (দেয়াজিক), উত্তরাসঙ্গ (বহির্বাস), অন্তর্বাস, ভিক্ষাপত্র, ক্ষুর, সূচী, কটিবন্ধনী এবং জলছাকনী প্রভৃতি অষ্ট পরিষ্কার সংগ্রহ করবেন এবং তারপর একজন উপযুক্ত ভিক্ষুর নিকট গিয়ে নিম্নলিখিতভাবে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করবেন, "ওকাস অহং ভন্তে, পব্বজ্জং যাচামি," দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার একইভাবে প্রার্থনা করতে হবে। ভিক্ষু রাজী হয়েছে মনে হলে তাঁকে এইভাবে চীবর প্রদান করতে হবে, "ভন্তে, সংসার দুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভ করবার জন্য নির্বাণ সাক্ষাত করবার জন্য আমার এই কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার আমি এইভাবে প্রার্থনা করছি।" এরপর ভিক্ষু চীবর গ্রহণ করে যথা নিয়মে ত্রিশরণ ও দশশীল আবৃত্তি করে প্রব্রজ্যা প্রদান করবেন। এইভাবে প্রব্রজ্যা প্রদানের পর গুরু তাকে নতুন নামে অভিহিত করবেন এবং আপদে বিপদে উপদেশ ও অনুশাসন করে রক্ষা করবেন।

শ্রাবণের নিত্য প্রয়োজনীয় শীল ও ব্রত সম্পর্কে বিনয় পিটকে আলোচনা করা হয়েছে এভাবে: সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক নিতান্ত নির্বোধ বালককে প্রব্রজ্যা দেওয়া অনুচিত। প্রব্রজিত ব্যক্তি সবসময় গুরুর আদেশ মেনে চলবে। তাঁর অনুমতি ছাড়া শ্রমণগণ বিহারের বাইরে যেতে পারবে না। বিহার প্রাঙ্গনে ও গ্রামে শ্রামণের পৃথক পৃথক নিয়ম পালন করবে। ৭৫ প্রকার সেখিয়া শ্রমণগণ পারতপক্ষে ভঙ্গ করবে না। গৃহীদের সাথে অত্যধিক মেলামেশা করবেনা। গুরুর অনুমতি নিয়ে ৩২ প্রকার অশুভ চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করবে। মনোযোগের সাথে গুরুর সেবা করবে। 'দীনচরিয়া' নামক এক সিংহলী গ্রন্থে বলা হয়েছে, শ্রামণেরগণ ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সম্পন্ন হবে। তাঁরা সকালে ঘুম থেকে উঠে বিহার প্রাঙ্গন, বোধিমন্ডপ, চৈত্য ও সীমাঘর সমার্জন করবে। পুকুর বা কূপ থেকে প্রয়োজনীয় জল নিয়ে আসবে। উপযুক্ত আহার গ্রহণ করে অরণ্য বা বৃক্ষমূলে বসে চার প্রকার অপ্রমেয় ভাবনায় রত হবেন। ভিক্ষা সংগ্রহ করার সময় পাত্র চীবর গ্রহণ করে গুরুর সাথে গ্রামে গমন করবেন। দুপুরে অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গুরুর কাছে পড়তে বসবে। সন্ধ্যা সময় বিহার প্রাঙ্গনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করবে। তারপর গুরুর পদ প্রক্ষালন করে কিছুক্ষণ 'মঙ্গলসূত্র', 'রতনসূত্র', প্রভৃতি আবৃত্তি করে ঘুমাতে যাবে। ঘুমানোর সময় ৩২ প্রকার অশুভ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে।[২০]

শ্রামণের বয়স ২০ বর্ষে পদার্পণ করলে তাকে উপসম্পদা প্রদান করা বিধেয়। শ্রমণ হতে ভিক্ষুত্বে উন্নীত করবার জন্য যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় তাকে 'উপসম্পদা' বলে। বুদ্ধঘোষের সামন্ত পাসাদিকায় আট প্রকার উপসম্পদার উল্লেখ আছে। সময় ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এদের কোনটাই যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়নি। কেবল 'ঞত্তিচতুত্থ কম্ম'ই আজ পর্যন্ত ভিক্ষু সমাজে প্রচলিত। উপসম্পদা গ্রহণকারী ব্যক্তি মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুদের ব্যবহার্য অষ্ট পরিক্খার সংগ্রহ করে কোন ভিক্ষুর শরণাপন্ন হবেন। সেই ভিক্ষু সাধারণত তার উপাধ্যায় হন। তিনি প্রার্থীকে ভিক্ষুসংঘের নিকট পরিচিত করে দিবেন। ভিক্ষু প্রার্থীর শারীরিক উপযুক্তদাদি পরীক্ষা করে 'ঞত্তিচতুত্থ কম্মবাচা' পাঠ করে উপসম্পদা প্রদান করবেন। উপসম্পদা প্রদানের পর আচার্য ও উপাধ্যায় স্থির করে দিবেন।

উপাধ্যায় প্রথমেই তাঁর শিষ্যকে পাতিমোক্খে বর্ণিত ২২৭ শীল ও চতুর্থ নিস্সয় সম্পর্কে অবহিত করবেন।[২১] অন্য কোন রকমের লাভ সৎকার উৎপন্ন না হলে এই চার প্রকার নিয়মই ভিক্ষুদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু পাক্ষিকভত্ত, গমিকভত্ত নবান্ন প্রভৃতি নানা প্রকার লাভ সৎকার উৎপন্ন হলে পরিমাণে উপভোগ করতে ভিক্ষুদের কোন আপত্তি নাই। তবে কোন প্রকার বাহুল্যে আশ্রয় নেওয়া ভিক্ষুদের উচিত নয়। সাধারণত নব উপসম্পন্ন ভিক্ষুগণ তাদের আচার্য ও উপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বৎসর ধরে ধর্ম বিনয় শিক্ষা লাভ করবেন। কখনও গুরুর প্রতি অবাধ্য হয়ে প্রমত্তভাবে বিচরণ করবেন না। গুরুকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করবেন।

জন্মান্তরবাদ

বৌদ্ধরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। কর্মবাদ অনুযায়ী মানুষ যাই করুক না কেন– কোন কাজই বিনষ্ট হয় না, সবই তার জীবনে সঞ্চিত থাকে। এ জন্মে না হোক পরজন্মে সে এর ফল ভোগ করবে। বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তর বলতে কোনো চিরন্তন আত্মার এক দেহ ছেড়ে নতুন দেহ ধারণ করাকে বুঝায়। এখানে জন্মান্তর হলো– বর্তমান জীবন হতে কৃত কর্মানুযায়ী পরবর্তী জীবনের উদ্ভব; 'মিলিন্দ প্রশ্নে' বলা হয়েছে একটি প্রদীপ হতে অন্য প্রদীপ জ্বালানো যায়- তেমনি এক জীবনের শেষ অবস্থা হতে পরবর্তী জীবনের প্রথম অবস্থায় সৃষ্টি হতে পারে। জন্মান্তর হলো এক চেতনা থেকে আর এক চেতনার সৃষ্টি, এক মানসিক প্রক্রিয়া থেকে অন্য এক মানসিক প্রক্রিয়ার জন্ম; এক জীবনের শেষে অন্য এক জীবনের উদ্ভব। বুদ্ধের মতে এ জগতের প্রতিটি জিনিস কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ। আমরা যে কর্মই সম্পাদন করি না কেন, তার একটা ক্রিয়া আছে। তাই আমাদের বর্তমান জীবন যেমন অতীত কর্মের পরিণতি, ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ জীবন হবে বর্তমান কর্মের ফল। কর্ম হলো এক ধরণের অদৃশ্য শক্তি, এক জীবনের সাথে অন্য জীবনের যোগসূত্র। ভদন্ত নাগসেন এখানে উপমা প্রদান করেছেন– একটি জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে অনায়াসে আরেকটি প্রদীপ জ্বালানো যায়। এভাবে উৎপন্ন হলেও প্রদীপের দ্বিতীয় শিখাটি যে প্রথম শিখা হতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে যতই নতুন এবং পৃথক হোক না কেন– এদের মধ্যে যে এক গভীর অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বিদ্যমান– তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কারণ প্রথম প্রদীপ হতে দ্বিতীয়

প্রদীপ যা গ্রহণ করে তা প্রত্যক্ষভাবে আগুন হলেও পরোক্ষভাবে আরো অনেক কিছু। যেমন প্রথম প্রদীপটি যে তেল ও সলতে পুড়িয়ে এ আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল– সেই তেল ও সলতের অবদানই কি কম? বস্তুত এরাই তো আগুন প্রজ্বলিত রেখেছিল। যার কারণে দ্বিতীয় প্রদীপটি আগুন পেতো। সেই তেল ও সলতেটুকু এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এদের রচিত শিখাই যে দ্বিতীয় শিখার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে তা বলা বাহুল্য। অর্থাৎ বলা যায় এদের অতীত কর্মফলই দ্বিতীয় প্রদীপটির মধ্যে এখন জ্বলন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রথম প্রদীপের কর্মফল এখন দ্বিতীয় প্রদীপ ভোগ করছে। আত্মা বা পরিবর্তনশীল চেতনা প্রবাহ সম্বন্ধেও ঠিক একথা প্রযোজ্য। পূর্বতন শিখা হতে যেমন নতুন শিখার আবির্ভাব হয়, ঠিক তেমনি পূর্বতন অস্তিত্ব বা সন্ততি হতেই নতুন অস্তিত্বের উদ্ভব হয় এবং পুরাতন প্রদীপের কর্মফল যেমন নতুন শিখা বা প্রদীপের মধ্যে প্রজ্বলিত থাকে, তেমনি পুরাতন প্রদীপের কর্মফলও নতুন সত্ত্বার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। অতএব পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করতে হলেই আত্মাকে যে চিরস্থায়ী বা অবিনশ্বর হতে হবে এমন কোনো অর্থ নেই।

আবার দুধ হতে দই, ছানা হতে ঘি উৎপন্ন হয়। তবে কেউ যদি বলেন যা দুধ তা-ই দই, যা ছানা তা-ই ঘি, তাহলে ঠিক বলা হলো না। এখানে দই দুধ নয় এবং দুধ হতে পৃথকও নয়, কারণ দুধকে আশ্রয় করে তৎসমুদয় উৎপন্ন হয়েছে। এভাবে ধর্ম সন্ততি বা বস্তু ধর্ম প্রবাহ সম্মিলিত হয়। একটা নিরুদ্ধ হয়, আবার অন্যটা উৎপন্ন হয়। যা নিরুদ্ধ হয় ঠিক তা উৎপন্ন হয় না, নিরুদ্ধমান বস্তুর ধর্মপ্রবাহ উৎপাদ্যমান বস্তুতে সম্মিলিত হয়। এজন্য বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয় যে, পরজন্মে যে উৎপন্ন হয় সে সেও নয়, অন্যও নয়। আজকের আমি অতীতের কর্ম ও জ্ঞান সমষ্টির ফল মাত্র আর বর্তমান আমি ভবিষ্যতের কারণ। এই কার্যকারণ বা হেতুফল পরস্পর জলতরঙ্গের মতো প্রবাহিত হতে থাকে। সুতরাং তরঙ্গের সাথে তরঙ্গের যে সম্বন্ধ এ জন্মের সাথে পরজন্মেরও সেই একই সম্বন্ধ। গতকালের 'আমি' আর আজকের 'আমি' এক আমি হলেও যেমন পুরোপুরি এক নয়। যেমন জলপ্রবাহ নিরন্তর চলছে, কিন্তু এক নয়।[২২] বস্তুত বস্তুর স্থিতিশীলতায় এক অবস্থা উৎপন্নের সাথে সাথে পূর্বাবস্থার নিরোধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রবাহ চলতেই থাকে, এর মধ্যে কোনো প্রকার ফাঁক থাকে না। জন্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারেও ঠিক একই অবস্থা। এক জন্মের অন্তিম বিজ্ঞানের সাথে সাথে পুনর্জন্মের প্রথম বিজ্ঞান উদয় হয়। বলা যায় জীবন হলো মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ– যা নদীর স্রোতের মতো প্রবাহিত হচ্ছে এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে। এভাবে জন্ম হতে জন্মান্তরে ধারাবাহিকতার স্রোত বয়ে চলেছে একটার পর একটা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। তাই এখানে কোন চির শাশ্বত আত্মা টিকে থাকতে পারে না। এই জগতের সবই নশ্বর, তবে নশ্বর হলেও এদের মধ্যে কিন্তু এক অবিনশ্বর ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। যেমন প্রদীপ শিখা নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী হলেও অসংখ্য শিখার মাধ্যমে এক অনন্ত ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন এ নশ্বর আত্মা বা সন্ততি অসংখ্য আত্মার মাধ্যমে এক অবিনশ্বর ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না সে কি জানতে পারে আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করব কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে আয়ুষ্মান নাগসেন বলেছেন, ব্যক্তি তা জানতে পারে সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে না। উপমায় তিনি বলেছেন– যদি কোন কৃষক-গৃহপতি (ক্ষেত্র) কর্ষণ ও বীজ বপন করে ধ্যানাগার পূর্ণ করে, অন্য সময় সে কর্ষণ বপন করে না। এবং সঞ্চিত ধান রাশি বসে ভোগ করে, বিতরণ করে কিংবা নিজেদের প্রয়োজনানুসারে খরচ করে, তবে সে জানতে পারে যেমন তার ধান্যাগার আর পূর্ণ হবে না। তেমনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করবার যে সকল হেতু প্রত্যয় আছে সেই সকল নষ্ট হলে সে জানতে পারে– 'আমি আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করব না।"

কর্মবাদ

এই জগতে কেউ স্বল্পায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ স্বাস্থ্যবান, কেউ রুগ্ন, কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিৎ, কেউ অন্ধ, বধির ও বিকৃতাঙ্গযুক্ত, কেউ সুদর্শন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অধিকারী, কেউ চোর-ডাকাত, কেউ ধার্মিক, কেউ ক্ষমতাশালী, কেউ ক্ষমতাহীন, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ মূর্খ, কেউ পণ্ডিত ইত্যাদি বৈষম্য সম্পর্কে মিলিন্দরাজ আয়ুষ্মান নাগসেনকে প্রশ্ন করলে উত্তরে নাগসেন বলেন, মানুষের কৃতকর্মের কথা অর্থাৎ কর্মফলের জন্য মানুষে মানুষে এই ভেদাভেদ। অবিদ্যা বা অজ্ঞতাই (বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব) কর্মের প্রধান কারণ। অবিদ্যার সাথে কর্মের দ্বিতীয়কারণ তৃষ্ণা যুক্ত হয়। সকল প্রকার পাপকর্মের মূল কারণ হলো এই অবিদ্যা ও তৃষ্ণা। আচার্য নাগসেন বলেছেন, এই ক্ষণ পরিবর্তনশীল নামরূপের মধ্যে কর্ম সঞ্চিত থাকে না। কিন্তু নামরূপকে ভিত্তি করে এটা প্রবর্তিত হয় এবং উপযুক্ত মুহূর্ত এলে ফল প্রদান করে। যেমন আম আম গাছের কোথাও লুকিয়ে থাকে না। তবে আম গাছকেই ভিত্তি করে এর অবস্থিতি এবং যথা সময়ে আম আকারে এর আবির্ভাব। বায়ু বা তেজ যেমন কোনো স্থানে লুকিয়ে থাকে না, কার্যকারণ শৃঙ্খলার দ্বারা এদের অনুভব করা যায়; ঠিক তেমনি এই নামরূপ সমন্বিত কায়ের ভিতর বা বাইরে কোথাও অবস্থান করে না।

সকল জীব নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে, সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মেরই উত্তরাধিকারী, নিজের কর্মানুসারেই বিভিন্ন যোনিতে উৎপন্ন হয়। নিজের কর্মই নিজের বন্ধু, নিজের কর্মই নিজের আশ্রয়। কর্মই প্রাণিগণকে হীন কিংবা উত্তমরূপে বিভাগ করে থাকে। যে যেমন কর্ম করবে, সে ঠিক তেমনি ফল পাবে। কেউ যদি ধানের বীজ বপন করে, তবে ধানই পাবে, গম পাবে না। আর যদি খারাপ বীজ বপন করে তবে খারাপ ধান পাবে; ভাল ধান পাবে না। যেমন কাজ তেমন ফল। পৃথিবীর কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। আমরা পূর্বে যে কাজ করেছিলাম এখন তার ফল ভোগ করব। আবার এখন যা করছি পরে তার ফল ভোগ করব। ভাল কাজ করে থাকলে ভাল ফল আর খারাপ কাজ করে থাকলে খারাপ ফল পাব। মোটকথা নিজ নিজ কর্মফল আমাদেরকে ভোগ করতেই হবে। বিশ্বে বৈষম্য, বিশ্বের রহস্য ও প্রাণীর বিভিন্নতার একমাত্র কারণ এই কর্ম। জীবের জীবন কর্মময়। বুদ্ধ বলেছেন, 'চেতনাহি অহং কম্মং বদামি'– অর্থাৎ চেতনাকে আমি কর্ম বলি। অন্তরের চেতনাই কর্মের নামান্তর। প্রত্যেক জীব নিজ নিজ কর্মের দৃশ্যমান স্থূল প্রতীক। কর্মই জীবের বন্ধনের কারণ, আবার এ কর্মই বন্ধনমুক্তি বা

নির্বাণ লাভের কারণ হতে পারে। মানুষের পূর্বজন্ম, বর্তমান জীবন এবং পরজন্ম বা ভবিষ্যৎ জীবন এ তিনটির মধ্যে যে যোগসূত্র আছে তা হলো তার কৃতকর্ম। এক মুহূর্তের একটি ক্ষুদ্র চেতনা বা কর্মজীবনের সুখ-দুঃখ ভোগাদি ফলদান করতে পারে, এমনকি পুনর্জন্ম সংঘটন করতে সমর্থ। চিত্ত বা মনভেদে কর্ম দু'প্রকার– কুশল ও অকুশল কর্ম। কুশল কর্ম মানুষকে উত্তরোত্তর নির্বাণ বা চরম মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, অন্যদিকে অকুশল কর্ম মানুষকে জন্ম হতে জন্মান্তরে চক্রের মতো ঘুরায়। লোভ, দ্বেষ, মোহ এ তিনটি অকুশল কর্মের হেতু আর অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ এ তিনটি কুশল কর্মের মূল বা হেতু। অন্তর্নিহিত মানসিক চেতনাটি যে কোনো হেতু সংযোগেই কর্মে পরিণত হয়। এই মানসিক কর্ম অবকাশ পেলে বাক কর্মে রূপায়িত হয়। বিভিন্ন বস্তু সংযোগে জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, গন্ধ ও রসযুক্ত হয়, তেমনি লোভ, দ্বেষ, মোহাদি বিভিন্ন মানসিক অবস্থার সহযোগিতায় কর্ম ও বিবিধ শক্তি, গুণ ও অবস্থাসম্পন্ন হয়। এর ফলে বিচিত্র কর্মফল ভোগী প্রাণী জগতে দেখা যায়। কর্মের ফল বা বিপাক প্রধানত তিন প্রকার– জাতি বা জন্ম, আয়ু ও ভোগ। সৎ কর্ম করুক বা অসৎ কর্ম করুক যে যেই কর্মই করুক না কেন জীবগণ তারই উত্তরাধিকারী হয়। তাই প্রাণিজগতে বিশেষত মানব সমাজে কেউ পণ্ডিত, কেউ মূর্খ, কেউ ধার্মিক, কেউ চোর, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা, কেউ রাজা, কেউ প্রজা– এসব ভেদাভেদের একমাত্র কারণ কৃতকর্ম।

প্রাণীগণের জীবনের দু'টি দিক রয়েছে– একটি আধ্যাত্মিক ও অপরটি বাহ্যিক। আধ্যাত্মিক দিক বলতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন আর বাহ্যিক বলতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ভাব। এই আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্যিক বিষয়ের সংঘর্ষেই কর্ম গঠিত হয়। এই সংঘর্ষের বিরাম নেই, আর কর্ম গঠনেরও ফাঁক নেই। যতক্ষণ জীবগণ গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে বাহ্য সম্পর্ক শূন্য না হয়, ততক্ষণ জাগরণে, অর্ধ জাগরণে, এমনকি স্বপ্নাবস্থায় কর্ম চেতনা বিভিন্নভাবে অবিরাম ধাবিত হয় এবং এতে শুভাশুভ কর্ম গঠিত হয়। এভাবে উৎপাদিত কর্ম চিত্ত প্রবাহে সঞ্চিত থাকে এবং পরে উপযুক্ত ও অনুকূল অবস্থায় ফলদান করতে থাকে।

মিলিন্দপ্রশ্নে বলা হয়েছে একটি বীজের মধ্যে ভবিষ্যতের বৃক্ষ, শাখা-প্রশাখা, ফুল-ফল ইত্যাদি প্রচ্ছন্ন উপাদান রূপে নিহিত থাকে; কালে যদি জল, বায়ু, রৌদ্র ও মাটি লাভ করে তবে যথা নিয়মে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং বৃক্ষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকাশ লাভ করে। সেরূপ প্রাণিগণের জীবনে শুভাশুভ কর্ম সম্পাদিত হয়, কালে উপযুক্ত প্রসঙ্গ লাভ করলে যথানিয়মে ফল উঠে। যেমন কর্ম তেমন ফল হবেই। কুশল কর্মে কুশল আর অকুশল কর্মে অকুশল। এ রকম কর্মফল পরিচালনা করার জন্য কোনো ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। মৃত্যুর পরে প্রাণিগণের কর্মফল প্রাণি হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, সংস্কাররূপে তা এদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ প্রাণী নিজেই নিজের কর্মফল বহন করে নিয়ে আসে, পিছনে ফেলে আসে না। এই কর্মবিধানের কথা রাজা মিলিন্দ ও আয়ুষ্মান নাগসেনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে ফুটে ওঠেছে। এই কর্মবিধানকে স্বীকার করে বুদ্ধ ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেন নি। বরং মানুষ ইচ্ছার স্বাধীনতার দ্বারা তার কর্মের গতি ফিরিয়ে কর্মফলে রূপান্তর সৃষ্টি করতে

পারে তা তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। বুদ্ধের মতে কর্ম নিয়ম যান্ত্রিক নিয়ম নয়। এই নিয়ম স্বীকার করে যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ তিনটির মধ্যে মানুষ ইচ্ছা করলে তার পূর্বকর্মের পরিবর্তন করে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তর ঘটাতে পারে। তেমনিভাবে বর্তমানে কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের সুন্দর জীবন গড়তে পারে। এমনকি মানুষ কুশল কর্মের প্রভাবে অমৃতময় নির্বাণ লাভ করতে পারে। বৌদ্ধ দর্শন বিশ্বাস করে মানুষের ভালো মন্দের পিছনে কোন অদৃশ্য শক্তির হাত নেই। নিজের কৃতকর্মের নিয়ন্ত্রক অন্য কেউ না হয়ে মানুষ নিজে হওয়ায় বরং মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে আরও বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

অর্হত্বের লক্ষণ

বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ লাভের চারটি স্তর বা ধাপ আছে। যেমন– (১) স্রোতাপন্ন, (২) সকৃতাগামী, (৩) অনাগামী ও (৪) অর্হত্ব। কায়মনবাক্যে দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ বর্জন করে যারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ করে চতুরার্য সত্যের সম্যক উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা স্রোতাপন্ন নামে পরিচিতি। জীবনের পবিত্রতা দ্বারা তাঁরা সংসারের স্রোত অতিক্রম করে নির্বাণ স্রোতে পতিত হন। এদেরকে সংসারে আরও শতবার আসতে হলেও নির্বাণ তাঁদের সুনিশ্চিত। যাঁরা লোভ, দ্বেষ, মোহের সম্পূর্ণ ক্ষয় করেছেন তাদেরকে সকৃদাগামী বলা হয়। এ সংসারে তাঁদের আর একবার মাত্র আগমনের পরে নির্বাণ লাভ হয়। অনাগামীদেরকে আর এ সংসারে মোটেই আসতে হয় না। তাঁরা এ জন্মেই বা দীর্ঘকাল শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে বাস করে আমিত্ব জ্ঞানের নিরোধ দ্বারা নির্বাণ লাভ করেন। কায়মনবাক্যে শ্রদ্ধা ও দান, শীল, নৈষ্ক্রমাদি দশ পারমিতা প্রাপ্ত অর্হতগণ এ জন্মের দেহত্যাগ মাত্রই নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। অর্হত্বই চরম ও পূর্ণ পবিত্রতম অবস্থা এবং মানুষের সার্বিক ও অন্তিম মুক্তি। এই অবস্থায় সাধকের আর কোন প্রকার রাগ, দ্বেষ, মোহ ও ধর্মাধর্ম থাকে না। অর্হতকে আর এ সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তাঁর দেহ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু সে দেহে পাপাদি প্রবেশ করতে পারে না। দুঃখময় অস্তিত্ব বীজ পূর্বেই শুকিয়ে যাওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যু এসে তাঁর দেহের বিনাশ সাধন করে এবং তিনি নির্বাণ গমন করে পরম সুখে পতিত হন। অর্হতগণের চিত্তে কোন প্রকার ভয়-ভীতি থাকে না। ভদন্ত নাগসেন বলেছেন, অর্হতগণ একমাত্র শারীরিক বেদনা অনুভব করেন, মানসিক নয়। অর্হতের মন দেহকে আশ্রয় করে চলে। দেহের উপর অর্হতগণের কোন অধিকার ও স্বাধীনতা থাকে না। দশবিধ দেহানুগত গুণ জন্মে জন্মে দেহের অনুসরণ করে, অনুপরিবর্তিত করে। এই দশগুণ হলো শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, পায়খানা, প্রস্রাব, তন্দ্রালস্য, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু। এই সকল বিষয়ে অর্হতগণের কোন অধিকার, স্বাধীনতা, কিংবা বশিতা চলে না। পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী আছে, তারা সবাই পৃথিবীকে আশ্রয় করে বাস করে। বিচরণ করে ও জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ পৃথিবীর উপর তাদের আদেশ কিংবা আধিপত্য চলে না। ঠিক তেমনি অরহতের চিত্ত দেহাশ্রয়ে চলে, কিন্তু দেহের উপর অরহতের কোন আদেশ বা আধিপত্য চলে না। সাধারণ মানুষ দৈহিক ও মানসিক বেদনা অনুভব করেন। কিন্তু যারা অর্হত তাঁরা কেবল মানসিক বেদনা অনুভব করেন। কারণ অরহতের চিত্ত সমাধি-ভাবনায় সুভাবিত, উত্তমরূপে দমিত, বাধ্য ও

আজ্ঞাবহ হয়। সুতরাং তিনি যখন দৈহিক দুঃখ বেদনার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন, তখন সংসারে অনিত্যতার ধারণাকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করেন। সমাধিরূপ স্তম্ভে স্বীয় চিত্তকে আবদ্ধ করেন। এভাবে তাঁর চিত্ত চঞ্চল হতে পারে না। তা স্থির ও অবিক্ষিপ্ত থাকে। বেদনার বিকার জনিত বিস্ফোরণের দ্বারা তার দেহ আলোড়িত, প্রকোপিত ও আমূল পরিবর্তিত হয়। এজন্য অরহতগণ কেবল দৈহিক বেদনা অনুভব করেন। অর্হতগণের দেহ চঞ্চল হলেও চিত্ত অচঞ্চল থাকে। উপমায় বলা হয়েছে- একটি বড় বৃক্ষ আছে। তার কাণ্ড অনেক মোটা এবং শাখা-প্রশাখা বহু দীর্ঘ। যখন প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হয় তখন সেই গাছের কেবল শাখা-প্রশাখা আন্দোলিত হয়, কান্ড নয়। তেমনি অরহতগণ দুঃখ-বেদনায় স্পষ্ট হয়ে সংসারের অনিত্যতার ধারণা দৃঢ়রূপে গ্রহণ করেন। সমাধিরূপ স্তম্ভে স্বীয় চিত্তকে আবদ্ধ রাখেন। সেই সমাধি স্তম্ভে উপনিবদ্ধ তার চিত্ত কল্পিত হয় না, বিচলিতও হয় না। অবিক্ষিপ্তভাবে স্থির থাকে। বেদনার বিকার জনিত বিস্ফোরণে তাঁর দেহ আলোড়িত, প্রকম্পিত ও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তাঁর চিত্ত বৃক্ষকান্ডের মতো অকল্পিত ও অবিচলিত থাকে। গৃহী জীবনেও কেউ অর্হত্ব লাভ করতে পারেন। গৃহী যে দিন অর্হত্ব লাভ করেন, তাকে সেদিনই পরিনির্বাণ লাভ করতে হয়। গৃহীবেশ অর্হত্বের অনুকূল নয়। প্রতিকূল বেশধারীর চিহ্নের দুর্বলতা হেতু অর্হত্বপ্রাপ্ত গৃহী সে দিনেই প্রব্রজিত হন অথবা পরিনির্বাণ লাভ করেন। যারা অর্হত্ব লাভ করেন, তারা সকলেই স্মৃতিভ্রম মুক্ত, তাদের স্মৃতিসম্মোহ নাই। তবে অর্হত্বেরাও আপত্তিপ্রাপ্ত হন। কুটির নির্মাণ শিক্ষাপদে, ঘটকালি শিক্ষাপদে, বিকালে উচিত কালধারণায়, ভোজনের সময় নিবারিত হয়ে অনিবারিত ধারণায় এবং অতিরিক্ত অবিনয় কর্ম করেছে এই ভুল ধারণায়- এই জাতীয় কিছু শিক্ষাপদ বিষয়ে অর্হতের আপত্তি হতে পারে। যদি কোন অর্হৎ আপত্তিপ্রাপ্ত হন এবং অর্হতের অনাদরণীয় না থাকে তাহলে অর্হতের স্মৃতিভ্রম আছে। অর্হতের স্মৃতিভ্রম আর আপত্তিপ্রাপ্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে- যদিও অর্হতগণের স্মৃতি ভ্রম থাকে না তবুও অর্হতগণ আপত্তিপ্রাপ্ত হতে পারে। উপমায় বলা হয়েছে- লোক-বর্জনীয় ও প্রজ্ঞপ্তি-বর্জনীয় হিসাবে কলুষ দ্বিবিধ। লোক বর্জনীয় বলতে প্রাণী-হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, প্রলাপ করা, লোভ, দ্বেষ ও ভ্রান্ত ধারণা এই দশবিধ অকুশল কর্ম। পথ প্রজ্ঞপ্তি বা বুদ্ধের আদেশ হেতু বর্জনীয় বলতে জগতে যা ভিক্ষুদের পক্ষে অন্যায় ও অনুচিত কাজ আছে, তা গৃহীদের জন্য দোষের নয়। ভগবান ভিক্ষু শিষ্যদের জন্য যাবজ্জীবন অলঙ্গনীয় রূপে সেই শিক্ষাপদসমূহ নির্দেশ করেছেন; যেমন বিকাল ভোজন সাধারণ গৃহীর পক্ষে কোন অপরাধ নয়। কিন্তু ভিক্ষুদের পক্ষে তা সঙ্গত নয়। পুষ্প পত্র ছেড়া গৃহীদের জন্য দোষের নয়। কিন্তু তা ভিক্ষুদের পক্ষে অন্যায়। জলে হাস্য-ক্রীড়া গৃহীদের পক্ষে নির্দোষ আনন্দ। কিন্তু ভিক্ষুদের পক্ষে তা অন্যায়। এগুলো হলো প্রজ্ঞপ্তি বর্জনীয়, বা ভিক্ষু বহির্ভূত বলা হয়। যা লোকবর্জনীয় পাপকর্ম তা অর্হতের পক্ষে আচরণ করা অসম্ভব। যে কোন প্রজ্ঞপ্তি বর্জনীয় বিষয় না জানার দরুণ আপত্তি হতে পারে। কোন অর্হতের পক্ষে সবকিছু জানা সম্ভব নয়। সমস্ত জানবার মত তাঁর শক্তি থাকে না। নরনারীর নাম ও গোত্র অর্হতের জ্ঞাত থাকতে পারে। ভূতলের রাস্তা-ঘাট

তার অজানা থাকতে পারে। যে কোন অর্হৎ কেবল তাঁর নিজের বিমুক্তি সম্বন্ধে জানতে পারে। ষড়ভিজ্ঞ অর্হৎগণ নিজেদের আরও বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। কেবল সর্বজ্ঞ বুদ্ধই সমস্ত কিছু সম্পর্কে যথার্থ জানতে পারেন।[২৩]

নির্বাণ

পালি 'নিব্বান', বাংলা 'নির্বাণ' শব্দটি 'নি' উপসর্গের সাথে 'বাণ' শব্দ সহযোগে নির্বাণ পদ সিদ্ধ হয়। এখানে 'বাণ' শব্দ তৃষ্ণা বা বন্ধন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তৃষ্ণার কারণে মানুষ পৃথিবীতে বারবার জন্মগ্রহণ করে মহাদুঃখ ভোগ করে। এজন্য তৃষ্ণাকে 'বাণ' নামে অভিহিত করা হয়। 'বাণ' শব্দের অর্থ 'তীর' ও হতে পারে। রাগ, দ্বেষ, মোহসজ্ঞাত, ক্লেশতীর, বর্তমান না থাকায় একে 'নির্বাণ' বলা হয়। 'নি' উপসর্গের দ্বারা তৃষ্ণা বা দুঃখের অভাব সূচিত হয়। যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে লোকের স্বকীয় তৃষ্ণাবন্ধন নিরবশেষভাবে ছিন্ন হয় তাকে নির্বাণ বলে। নির্বাণকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সোপাদিশেষ নির্বাণ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণ।[২৪] বৌদ্ধধর্মে চরম ও পরম লক্ষ্য নির্বাণ। অনিত্য, অনাত্মা ও নির্বাণ-বৌদ্ধধর্মের এ তিনটি ভিত্তি স্তম্ভের মধ্যে নির্বাণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপর্ণ। 'ভব' অর্থাৎ পুর্নজন্মের নিরোধ হওয়াই নির্বাণ। ভব সন্তুতি উচ্ছেদের নাম নির্বাণ। এখানে ভব বলতে সংসারকে বুঝানো হয়েছে। সকল তৃষ্ণা ক্ষয় করে বলে নির্বাণ। নির্বাণ রাগ,দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণা, সবকিছুর ক্ষয় সাধন করে মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। নির্বাণ চিত্তের এমন এক অবস্থা যা সর্ব উপাধি বর্জিত ও সর্ব সংস্কার বিমুক্ত। রোগ, শোক, ভয়, ভীতি প্রভৃতি সংসারের কোনো প্রকার মালিন্য একে স্পর্শ করতে পারে না। নির্বাণ এমন এক অমৃতপদ যা পরম শান্তিপ্রদ এবং পরম সুখকর। এটা অদুঃখ, অজর, অমর ও অব্যাধি বর্জিত চিত্তের এমন এক অনির্বচনীয় অবস্থা যা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার চিত্তের আলম্বন ত্যাগ করতে পারলেই অনুভূত হয়।

মিলিন্দ প্রশ্নেও নির্বাণকে মানুষের পরম লাভ বলা হয়েছে। এটা অতুলনীয়, এর অস্তিত্ব, রূপ, সংস্কার, বয়স পরিমাণ প্রভৃতি প্রমাণ, উপমা, হেতু বা যুক্তির দ্বারা প্রকাশ্যযোগ্য নয়। নির্বাণ শান্ত, প্রণীত ও সুখকর- নির্বাণের সন্নিহিত কোনো অবস্থান নেই, তারপরও নির্বাণ বর্তমান। এটি অনীতি, নিরুপদ্রব, অভয়, ক্ষেম, শান্তি, সুখপ্রীতি, সূচিশীতল রূপে অনুভূত। কেবল যে নির্বাণ লাভ করেনি, সে কখনও নির্বাণের সুখ অনুভব করতে পারবে না। তবে সে জানতে পারে নির্বাণ প্রাপ্তির সুখ সম্পর্কে অনুভূতির কথা। উপমায় বলা হয়েছে কোন পুরুষ যেমন সর্প, কুকুর মানুষের মৃত, পঁচা দুর্গন্ধময়, কীটদষ্ট ও বীষ্টা পূর্ণ স্থান হতে সচেষ্ট উদ্যমের দ্বারা মুক্তি লাভ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তেমনি সম্যক প্রতিপন্ন ব্যক্তি যোনিশ মনস্কারের দ্বারা ক্লেশসমূহ হতে মুক্তি লাভ করে পরম শান্তি নির্বাণ উপভোগ করেন। 'সংজ্ঞা বেদয়িত' নামক নিরোধ সমাপ্তিতে মগ্ন হলেই নির্বাণের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। 'মিলিন্দ প্রশ্নে' বলা হয়েছে নিম্ন লিখিত দশটি কারণ বা উপমা। যা থেকে নির্বাণ সম্বন্ধে জানা যায়-

(১) নির্বাণ জলে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত। পদ্ম জলে উৎপন্ন ও বর্ধিত হলেও জলের কোনো স্পর্শ যেমন পদ্মের গায়ে লাগে না তেমনি যাবতীয় দুঃখ বেদনা নির্বাণকেও স্পর্শ করতে পারে না।

(২) শীতল জল উত্তাপ নিবারণ করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা নির্বাণের অনুরূপ। কারণ নির্বাণ লোভ, দ্বেষ ও মোহরূপ অগ্নির উত্তাপ নিবারণ করে মানুষের পরম শান্তি আনয়ন করে।

(৩) খাদ্যের কিছু গুণ নির্বাণে আছে। খাদ্য যেমন মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে শরীরে শক্তি সঞ্চার করে তেমনি নির্বাণও মানুষের যাবতীয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি সাধন করে মানুষকে পরম শান্তি, শক্তি ও পবিত্রতা প্রদান করে।

(৪) ঔষধের কিছু গুণ নির্বাণে পাওয়া যায়, কারণ ঔষধ যেমন রোগব্যাধির উপশম করে তেমনি নির্বাণও পার্থিব দ্বেষ ও ব্যাধির উপশম করে মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা নিবারণ করে।

(৫) সর্পি পিন্ডবের তিনটি গুণ নির্বাণে দেখা যায়; নির্বাণ সর্পি পিন্ডবের মতো বর্ণ, গন্ধ ও রস সম্পন্ন।

(৬) নির্বাণ একখন্ড মূল্যবান মণি সদৃশ। কারণ নির্বাণ বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রচুর আলোকোজ্জ্বল আনন্দ দান করে এবং এ আনন্দ চিরস্থায়ী। নির্বাণ রক্ত চন্দনের মতো গুণযুক্ত, দুষ্প্রাপ্য এবং জ্ঞানীজনের আকাঙ্খাযোগ্য।

(৭) নির্বাণকে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের সাথে তুলনা করা চলে; কারণ পর্বত-শৃঙ্গের মতো নির্বাণ দুর্গম, আলোকোজ্জ্বল ও রমণীয়।

(৮) আকাশের দশটি গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট আকাশের যেমন জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সুপ্রমহ ও চুরির অতীত, নির্ভরশীল, বিহগগামী, নিরাভরণ ও অনন্ত- তেমনি নির্বাণ ও জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, পুনর্জন্মের অতীত, দুষ্প্রমহ, অচোরহরণ এবং নির্ভরশীল, আর্যগামী, নিরাভরণ ও অনন্ত।

(৯) নির্বাণ রক্ত চন্দনের মতো গণযুক্ত, দুষ্প্রাপ্য এবং জ্ঞানীজনের আকাঙ্খাযোগ্য।

(১০) নির্বাণ সমুদ্রের মতো বিশাল ও বিস্তৃত। সমুদ্রে যেমন বহুপ্রাণী বাস করে তেমনি নির্বাণও তৃষ্ণামুক্ত বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আবাসস্থল। বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি একে তাঁদের সৎকার্যাবলির দ্বারা উৎফুল্ল করে রাখে।[২৫]

বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ খুবই জটিল একটি বিষয়। কোনো জল্পনা, কোনো বর্ণনা বা তর্কবিতর্কের মাধ্যমে নির্বাণের স্বরূপ ও অবস্থান জানা যায় না। নির্বাণকে জানার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা স্বয়ং উপলব্ধি। সাধারণ লোকের কাছে দুর্বোধ্য হলেও বুদ্ধ নির্বাণ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করেছেন। নির্বাণ হচ্ছে অচ্যুতপদ অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করলে তথা হতে চ্যুত হয়ে কোথাও পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। উপরন্তু, চ্যুত হবার মতো কোনো অবস্থাও অবশিষ্ট থাকে না। পুনরায় নির্বাণ হচ্ছে অত্যন্তপদ অর্থাৎ অন্তহীন বা অনন্ত পদ। নির্বাণ অসংস্কৃত অর্থাৎ কার্য-কারণ জ্ঞাত নয়। নির্বাণ অনুত্তরপদ বা শান্তিপদ।

কাল, পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে কাল বলে। কাল সম্পর্কে আয়ুষ্মান নাগসেন বলেন, যে সকল সংস্কার অতীত, বিগত, নিরুদ্ধ ও বিপরিণত হয়েছে, তাদের কাল নাই। যে সকল কর্ম ফলস্বরূপ ও যারা ফলোৎপাদন স্বভাবযুক্ত- যারা অন্য স্থানে পুর্নজন্ম প্রদান করে, তাদের জন্য কাল আছে। যে সকল সত্ত্ব মৃত্যুর পর অন্যস্থানে উৎপন্ন হয়েছে,

তাদের জন্য কাল আছে। যে সকল সত্ত্ব মৃত্যুর পর অন্য স্থানে উৎপন্ন হয় না, তাদের জন্য কাল নাই। আর যে সকল সত্ত্ব পরিনির্বাপিত হয়েছে, পরিনির্বাপিত হেতু তাদের জন্য কাল নেই।[২৬] ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের মূল হলো অবিদ্যা। অবিদ্যা প্রত্যয় হতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হতে নাম-রূপ, নাম-রূপ প্রত্যয় হতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-প্রত্যয় হতে উপাদান, উপাদান-প্রত্যয় হতে ভব, ভর-প্রত্যয় হতে জন্ম এবং জন্ম-প্রত্যয় হতে জরা-মরণ-শোক-পরিবেদন-দুঃখ-দুশ্চিন্তা-হতাশা উৎপন্ন হয়। এভাবে কালের সীমা চলতেই থাকে। কালের পূর্বসীমা ব্যাখ্যা করতে উপমায় বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি এক ক্ষুদ্র বীজ জমিতে বপন করে। সেই বীজ হতে অঙ্কুর জন্মে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে বৃক্ষ হয়। তাতে যে ফল ধরে, সেই ফলের বীজ নিয়ে আবার সে রোপন করে। সেই বীজ হতে আবার অঙ্কুর উৎপন্ন হয়ে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে বৃক্ষ হয় এবং তাতে আবার ফল ধরে। এই বীজের অন্ত নেই। এভাবে কালের ও পূর্ব সীমা জানা যায় না। পূর্বে ছিল না কিন্তু পরে উদ্ভব হয়েছে এমন পূর্বসীমা জানা যায় না। যেমন- অবিদ্যা। যদি কোন বস্তু না থাকে উৎপন্ন হয় এবং হয়ে বিলীন হয়, তবে তার পূর্ব সীমা জানা যায়, আবার যে সকল বস্তু না থেকে উৎপন্ন হয় এবং হয়ে বিলীন হয়- তবে এই প্রকার বস্তু দুই দিক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি দুই দিক থেকে বৃদ্ধিও প্রাপ্ত হতে পারে। যেমন এই পঞ্চ স্কন্ধ কেবল দুঃখ প্রবাহের বীজ রাশি। পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মিলিন্দপ্রশ্নে বলা হয়েছে- এই মহাপৃথিবী জলে প্রতিষ্ঠিত। জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত এবং বায়ু আকাশে প্রতিষ্ঠিত। জল যেমন বায়ু দ্বারা স্থির আছে, তেমনি সেই জলও বায়ুর দ্বারা স্থিত থাকে।

বুদ্ধ পূজা

বৌদ্ধধর্মে মহামানব গৌতম বুদ্ধের প্রতি তাঁর ভক্ত ও অনুসারীদের মাঝে পূজার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু বুদ্ধ সেই পূজা গ্রহণ করেন কি-না তা নিয়ে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' বিস্তারিত বর্ণনা দেন আয়ুষ্মান নাগসেন। বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেছেন এবং তিনি কোন প্রকার পূজা গ্রহণ করেন না। বোধিমূলে বুদ্ধত্বলাভের সাথেই তাঁর সকল পরিগ্রহ পরিত্যক্ত হয়েছে। তিনি পূজা গ্রহণ না করলেও দেবতা ও মনুষ্যগণ তাঁর শারীরিক (পুতাস্থিরূপ) ধাতু রত্নকে ভিত্তি করে তাঁর উপদিষ্ট জ্ঞান রত্নের অনুকূল আচরণ করে ত্রিবিধ (মনুষ্য), দিব্য ও মোক্ষ সম্পত্তি লাভ করে থাকেন। যেমন কোন মহা অগ্নিস্কন্ধ প্রজ্বলিত হয়ে নিভে যায়, আর কোন রকমের তৃণ-কাষ্ঠ প্রভৃতি ইন্ধন গ্রহণ করে না। তেমনি বুদ্ধ কোনরূপ পূজা গ্রহণ করেন না। সেই বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ নির্বাপিত হলে যেমন জগৎ অগ্নিশূন্য হয় না। অন্য শুষ্ক কাষ্ঠ দিয়ে পুনরায় অগ্নি উৎপাদন করা যায় এবং নিজের প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা হয়। ঠিক তেমনি বুদ্ধের উদ্দেশ্যে কৃত পূজা অবন্ধ্যা ও সফল হয়। দেবতা ও মানবগণ ভগবানের শারীরিক ধাতুরত্নকে ভিত্তি করে তথাগতের উপদিষ্ট জ্ঞানরত্নের অনুকূল আচরণ করে ত্রিবিধ সম্পত্তির অধিকারী হয়। এই কারণে পরিনির্বাপিত বুদ্ধ গ্রহণ না করলেও তাঁর প্রতি কৃত পূজা অবন্ধ্যা ও সফল হয়। যদি এক প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়ে ধীরে ধীরে থেমে যায়, থেমে যাওয়ার পর সেই প্রশমিত বায়ু পুনরায় উৎপন্ন হতে ইচ্ছা হয় না। কেননা বায়ু ধাতু

অচেতন পদার্থ, এর কোন ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু তালপত্র কিংবা পাখার সাহায্যে নিজের শক্তি, উদ্যোগ ও পুরুষকার দ্বারা বায়ু উৎপাদন করা যায়। সেই বায়ু দ্বারা উষ্ণতাকে শীতল করে এবং দাহ উপশম করে। যেমন-মহাবায়ু প্রবাহিত হয়, তেমনি ভগবানও দশ সহস্র লোক ধাতুতে শীতল, মধুর, শান্ত, সূক্ষ্ম, মৈত্রী বায়ুরূপ প্রবাহিত হয়। প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়ে যেমন শান্ত হয়েছে, তেমনি মহামানব বুদ্ধ মৈত্রী বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়ে সংসার হতে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয়েছে। যেমন উপশান্ত বায়ু পুনরুৎপত্তি ইচ্ছা করে না, তেমনি লোক হিতৈষী বুদ্ধের প্রপীড়িত হয়, তেমনি দেব ও মানবগণ ত্রিবিধ (লোভ, দ্বেষ, মোহ) অগ্নি সন্তাপ-পরিদাহ প্রপীড়িত 'তালপত্র' পাখা প্রভৃতি বায়ু উৎপত্তির কারণ হয়। তথাগতের ধাতু ও দাহ-পীড়িত হয়ে তালপত্র কিংবা পাখার সাহায্যে বায়ু উৎপাদন করে উষ্ণতা শীতল করে ও দাহ প্রশমন করে, তেমনি পরিনির্বাপিত তথাগত গ্রহণ না করলেও লোকেরা তাঁর ধাতু ও জ্ঞান রত্নকে পূজা করে কুশল কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এর দ্বারা ত্রিবিধ অগ্নি-সন্তাপ নির্বাপণ করতে সমর্থ হয়। বুদ্ধ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, জ্ঞান, দর্শন-পরিভাবিত শরীর ধাতুরূপ রত্ন, ধর্ম ও বিনয়ের অনুশাসনরূপ শান্তাকে রেখে স্বয়ং অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত হয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলেও ত্রিবিধ সম্পত্তি লাভ বন্ধ হয় নি। সংসার দুঃখ-প্রপীড়িত সত্ত্বগণ (ত্রিবিধ) সম্পত্তি কামনা করে ধাতু-রত্ন, ধর্ম ও বিনয়ের অনুশাসনকে উপলক্ষ্য করে সেই সম্পত্তি লাভ করতে পারেন। এই কারণেও নির্বাণ প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করলেও তাঁর উদ্দেশ্যকৃত সৎকার অবন্ধা ও সফল হয়। আমাদের দেহে আটানব্বই প্রকার রোগ হয়, মানুষেরা তা ইচ্ছা করে নিজের ওপর নিতে চায় না। তারপরও সব রোগ আমাদের দেহে উৎপন্ন হয়। তেমনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত পূজা গ্রহণ না করলেও তাঁর উদ্দেশ্যকৃত পূজা ও সৎকার অবন্ধা ও সফল হয়।

এছাড়া মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে ভূমিকম্প, সংসার ধর্ম, ঋদ্ধিবল প্রদর্শন, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ, অনুমান, ধুতাঙ্গ, উপমা কথা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ

১. বৌদ্ধদর্শনের রূপরেখা: জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৩০।

২. বৌদ্ধদর্শনের রূপরেখা: জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া; প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৩. বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা: শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (জেতবন বিহার পরিষদ, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা, পশ্চিম বঙ্গ, ১৯৮৩ ইং); পশ্চিমবঙ্গ, পৃ. ৮০।

৪. বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা: শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৫. মিলিন্দ প্রশ্ন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত; ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ.৩৪।

৬. বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন: আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির; কলিকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ১২৫।

৭. গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন: সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদিত); (মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা), ২০০৮, পৃ. ৬৪।

৮. বিশুদ্ধমার্গ: শ্রমণ পূর্ণানন্দ, কলিকাতা, ১৯৩৬, পৃ.১০০।

৯. বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব: ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ড. বেলু রাণী বড়ুয়া; পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১০, পৃ.১২৪।

১০. মিলিন্দ প্রশ্ন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩।

১১. রাহুল সাংকৃত্যায়নের বৌদ্ধ দর্শন: পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির; ৩য় সংস্করণ (কলিকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ), পৃ.৩১

১২. মিলিন্দ প্রশ্ন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪।

১৩. গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন: ড. সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত; মহাবোধি বুক এজেন্সী (কলকাতা, ২০০৮), পৃ.১১৩

১৪. মিলিন্দ প্রশ্ন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭।

১৫. গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন: ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

১৬. বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ.৮২।

১৭. মিলিন্দ প্রশ্ন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭।

১৮. মিলিন্দ প্রশ্ন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮।

১৯. বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা: জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া; প্রাগুক্ত, পৃ.২১।

২০. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড) : রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ.৫৭

২১. প্রাগুক্ত; পৃ.৫৮।

২২. বৌদ্ধদর্শনের রূপরেখা: জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া; প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬।

২৩. মিলিন্দ প্রশ্ন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; প্রাগুক্ত, পৃ.২২১।

২৪. বৌদ্ধদর্শনের রূপরেখা: জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া; প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

২৫. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড): রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

২৬. মিলিন্দ প্রশ্ন: পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির; প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬।

উপসংহার: বৌদ্ধ সাহিত্যে ত্রিপিটক বহির্ভূত পালি ভাষায় রচিত "মিলিন্দ পঞ্ঞহো" (মিলিন্দ প্রশ্ন) অত্যন্তমূল্যবান প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। যদিও এ গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্তর্ভূক্ত নয় তবুও এর গৌরব, যুক্তি-দার্শনিক ও সাহিত্যিক মূল্য ত্রিপিটকের অন্তর্গত এবং বৌদ্ধগমেরই সমগোত্রীয়। আমার কাছে এ গ্রন্থটি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত জটিল তত্ত্বগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ ও সমাধানকল্পে অদ্বিতীয়। গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতীয় মনীষার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আমার এই অভিসন্দর্ভটিতে যে সমস্ত বিষয় ফুটে ওঠেছে তা অত্যন্ত যুক্তি-তথ্য সমৃদ্ধ। কেননা "মিলিন্দ প্রশ্ন" হলো এমন একটি গ্রন্থ যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়। "মিলিন্দ প্রশ্ন" গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলত খ্রি. প্রথম শতক বা তার কিঞ্চিত পূর্ববর্তী সময়ে রচিত। গ্রন্থের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। তবে বলা যায় গ্রন্থের রচয়িতা আয়ুষ্মান নাগসেন অথবা রাজা মিলিন্দের কোন রাজ-কর্মচারী রচনা করে থাকবে। এর রচনাকাল নির্ণয়ে যে সমস্ত তথ্য উঠে এসেছে তাতে ধারণা করা যায় গ্রন্থের রচনাস্থল খুব সম্ভবত পাঞ্জাবের আশেপাশে ভারত বর্ষের মধ্যেই রচিত হয়। তবে যুক্তি-বিশ্লেষণ করে বলা যায় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে অথবা এর খুব কাছের কোন অঞ্চলে।

আয়ুষ্মান নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের জীবন-কাহিনীতে তাঁদের পুনর্জন্ম থেকে শুরু করে বর্তমান জীবনের প্রজ্ঞা, খ্যাতি, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে। আয়ুষ্মান নাগসেন ছিলেন কজঙ্গল গ্রামের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন আয়ুষ্মান এবং রাজা মিলিন্দ ছিলেন গ্রিক রাজ্যের মহাপরাক্রমশালী রাজা মিনান্ডার। ঘটনাক্রমে তাদের দেখা হয় এবং কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ দর্শনের জটিল তত্ত্বসমূহ সহজ-সরল ভাষায় 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে বর্ণিত হয়। রাজা মিলিন্দের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং আয়ুষ্মান নাগসেনের উত্তর দেওয়ার মধ্যে যে উপমা, ভঙ্গি, দূরূহ বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা পরিস্ফুটিত হয়েছে তা অসাধারণ বলা চলে।

মূল মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থটি ছয়টি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা: পূর্বযোগ, মিলিন্দ প্রশ্ন, লক্ষণ প্রশ্ন, মেন্ডক প্রশ্ন, অনুমান প্রশ্ন ও উপমাকথা প্রশ্ন। এছাড়াও বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন এবং মহাবর্গযোগিকথা এই দুইটি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, কুশল ধর্ম, অকুশল ধর্ম, ত্রিপিটকের অন্তর্ভূক্ত অনেক বিষয় ও তত্ত্বসমূহ মিলিন্দরাজের প্রশ্ন ও নাগসেনের উত্তরে প্রকাশ পেয়েছে। শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহামানব গৌতমবুদ্ধ দীর্ঘ ছয় বছর সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। দীর্ঘ ৪৫ বৎসর তিনি পৃথিবীতে সত্যের ধর্ম প্রচার করেছেন। এভাবে দীর্ঘ চার যুগ ধর্ম প্রচার করার পর আশি বছর বয়সে ৫৪৩ খ্রি.পূ. সালে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরে মল্লদের শালবনে গৌতমবুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধ পূর্ববর্তী সত্ত্বকে বোধিসত্ত্ব বলে। গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পূর্বজন্মে যে সমস্ত সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন তাকে বলা হয় পারমি। শ্রদ্ধা, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বীর্য, স্মৃতি হলো বৌদ্ধ দর্শনের কুশল ধর্ম। অবিদ্ধা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা,

উপাদান ভব, জাতি, জরা মরন হলো দ্বাদশ নিদান। এই দ্বাদশ নিদানের কারণে মানুষ জন্ম জন্মান্তরে জন্মগ্রহণ করে মহাদুঃখ ভোগ করে। জগতের সবকিছু ক্ষণিক ও অনিত্য। এখানে আত্মা বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

বৌদ্ধ ধর্মে প্রব্রজ্যা-উসম্পদা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাত বছর বয়সে বালককে প্রব্রজ্যা দেওয়া হয়। আর শ্রমণের বয়স যখন বিশ বর্ষে পদার্পণ করে তখন তাকে উপ-সম্পদা প্রদান করা বিধেয়। বৌদ্ধ দর্শনের আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর্মবাদ অর্হত্ব লাভ, নির্বাণ। মিলিন্দ প্রশ্নে নির্বাণের ব্যাখ্যা বিভিন্ন উপমা দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাণ হলো মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। নির্বাণের দশটি কারণ বা উপমা পাওয়া গেছে মিলিন্দ প্রশ্নে।

নির্বাণ জলে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত। পদ্ম জলে উৎপন্ন ও বর্ধিত হলেও জলের কোনো স্পর্শ যেমন পদ্মের গায়ে লাগে না তেমনি যাবতীয় দুঃখ বেদনা নির্বাণকেও স্পর্শ করতে পারে না।

শীতল জল উত্তাপ নিবারণ করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা নির্বাণের অনুরূপ। কারণ নির্বাণ লোভ, দ্বেষ ও মোহরূপ অগ্নির উত্তাপ নিবারণ করে মানুষের পরম শান্তি আনয়ন করে।

খাদ্যের কিছু গুণ নির্বাণে আছে। খাদ্য যেমন মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে শরীরে শক্তি সঞ্চার করে তেমনি নির্বাণও মানুষের যাবতীয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি সাধন করে মানুষকে পরম শান্তি, শক্তি ও পবিত্রতা প্রদান করে।

ঔষধের কিছু গুণ নির্বাণে পাওয়া যায়, কারণ ঔষধ যেমন রোগব্যাধির উপশম করে তেমনি নির্বাণও পার্থিব দ্বেষ ও ব্যাধির উপশম করে মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা নিবারণ করে।

সর্পি পিন্ডবের তিনটি গুণ নির্বাণে দেখা যায়; নির্বাণ সর্পি পিন্ডবের মতো বর্ণ, গন্ধ ও রস সম্পন্ন।

নির্বাণ একখন্ড মূল্যবান মণি সদৃশ। কারণ নির্বাণ বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রচুর আলোকোজ্জ্বল আনন্দ দান করে এবং এ আনন্দ চিরস্থায়ী। নির্বাণ রক্ত চন্দনের মতো গুণযুক্ত, দুষ্প্রাপ্য এবং জ্ঞানীজনের আকাঙ্খাযোগ্য।

নির্বাণকে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের সাথে তুলনা করা চলে; কারণ পর্বত-শৃঙ্গের মতো নির্বাণ দুর্গম, আলোকোজ্জ্বল ও রমণীয়।

আকাশের দশটি গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট আকাশের যেমন জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সুপ্রমহ ও চুরির অতীত, নির্ভরশীল, বিহগগামী, নিরাভরণ ও অনন্ত- তেমনি নির্বাণ ও জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, পুনর্জন্মের অতীত, দুষ্প্রমহ, অচোরহরণ এবং নির্ভরশীল, আর্যগামী, নিরাভরণ ও অনন্ত।

নির্বাণ রক্ত চন্দনের মতো গণযুক্ত, দুষ্প্রাপ্য এবং জ্ঞানীজনের আকাঙ্খাযোগ্য।

নির্বাণ সমুদ্রের মতো বিশাল ও বিস্তৃত। সমুদ্রে যেমন বহুপ্রাণী বাস করে তেমনি নির্বাণও তৃষ্ণামুক্ত বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আবাসস্থল। বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি একে তাঁদের সৎকার্যাবলির দ্বারা উৎফুল্ল করে রাখে।

বৌদ্ধ ধর্মে মহামানব গৌতম বুদ্ধের প্রতি তাঁর ভক্ত ও অনুসারীদের মাঝে পূজার প্রচলন রয়েছে। বুদ্ধ এই পূজা গ্রহণ করেন না। তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁকে দেবমানব পূজো দিয়ে পূর্ণ লাভ করেন। তাঁর এই পূজা অবন্ধ্যা ও সফল হয়।

পরিশেষে বলতে চাই যদি কেউ বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে চায় সেক্ষেত্রে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থের বিকল্প নেই। আমার এই গবেষণা কর্মে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থের রচনাকাল থেকে শুরু করে রচয়িতা, রচনাস্থল, গ্রন্থ বিভাগ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৌদ্ধ দর্শন 'মিলিন্দ প্রশ্ন' এর আলোকে খুব সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অভিধান ও বিশ্বকোষ

পালি-বাংলা অভিধান : শীলরত্ন ভিক্ষু সম্পাদিত; (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২)

পালি-বাংলা অভিধান : শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত (১ম ও ২য় খন্ড; বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০০১)

Dictionary of Pali Proper Names : G. P. Malalasekera; 2 vols, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1998 (rep.)

Pali-English Dictionary : T.W. Rhys Davids and william Stede; P.T.S. London, 1975.

Encyclopedia of Buddhism : G.P. Malalasekera; ceylon, 1961.

প্রাথমিক গ্রন্থ

মিলিন্দপ্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ) : পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রি.।

মিলিন্দ প্রঞ্ঞ (১ম খন্ড) : শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রি.।

মহাবগ্গো : সুবোধিরতন থেরো সম্পাদিত (বৌদ্ধ মিশন, রেঙ্গুন, ২৪৭৯ বুদ্ধবস্স, ১৯৩৫ খ্রি.)

ধম্মপদ : ধর্মাধার মহাস্থবির সংকলিত ও অনূদিত; বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা, ১৯৫৪ খ্রি.

পট্ঠান পালি, ১ম খন্ড : ডক্টর সুকোমল চৌধুরী; ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৭, খ্রি.

মহাবর্গ : প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত; যোগেন্দ্র রূপসী বালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড, কলিকাতা, ১৯৩৭ খ্রি.

দীঘনিকায় : ভিক্ষ শীলভদ্র অনূদিত অখণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৭ খ্রি.

মধ্যম নিকায় : শ্রী বেনীমাধব বড়ুয়া; কলিকাতা, ১৯৪০ খ্রি.

জাতক নিদান : শ্রীমৎ ধর্মপাল ভিক্ষু অনূদিত; বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা,

কলিকাতা, ২৫০৬ বুদ্ধাব্দ, ১৩৬৯ খ্রি.

বিশুদ্ধিমার্গ : শ্রমণ পূর্ণানন্দ; পুনমুদ্রণ, থাইওয়ান, ২০০৫ খ্রি.

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম : ড. অনুকুল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়; কলিকাতা, ১৯৮৯, খ্রি.

Milinda Panha : Pali Text Society; 1880,

Milindapanha : V. Trenckner; P.T.S London, 1962

Apadana : 2 vols ed M.F. Lilley, London Pali text society; 1925-7

A History of pre-Buddhistic Philosophy: B.M. Barua; University of calcutta, calcutta, 1921.

Mahavamsa : Pali text society; 1908. ed. E senaral, paris, 1882-97

Majjhima Nikaya, vol.1-111. : Ed.v. Trenckner and r. chalmers; P.T.S. London, 1902

Visuddhimagga : C.A.F. Rhys Davids ed. and tr; P.T.S, London, 1975.

Mahavamsa : Gciger's translation; P.T.S London, 1912

Buddhavamsa : ed. R.. Morris, London. P.T.S, 1882

সহায়ক গ্রন্থ :

পালি সাহিত্যের ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড : রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮০ এবং ১৯৮৮।

বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা : জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া; বাংলা একাডেমি, জ্যেষ্ঠ ১৪০৮/ জুন ২০০১

অভিধর্ম দর্শন : শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী; মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ, ১৯৮৫ খ্রি.।

মহামানব গৌতমবুদ্ধ : ড. সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত; মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ২০০৮ খ্রি.

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন	:	ঐ
বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব	:	ড. রেবত প্রিয় বড়ুয়া; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.
বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি	:	ড. আশা দাস; কলিকাতা, ১৯৬৯ খ্রি.।
ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ	:	সুকোমল বড়ুয়া এবং সুমন কান্তি বড়ুয়া; বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০০ খ্রি.
পালি সাহিত্যে ধম্মপদ	:	সুকোমল বড়ুয়া ও রেবত প্রিয় বড়ুয়া; বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭ খ্রি.
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	:	মনিকুন্তলা হালদার (দে); মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৬ খ্রি.
বুদ্ধবানীর মূলতত্ত্ব	:	ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া এবং ড. বেলু রানী বড়ুয়া; পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০ খ্রি.
পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগর জীবন	:	করুনানন্দ ভিক্ষু; বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, ১৯৯৪ খ্রি.

The Questions of king milinda (Q.K.M): T.W. Rhys Davids, Sacred Books of the east series (S.B. Vols. xxxv-xxxvi)

Milinda's Questions	:	Translated by I.B. Horner; vols. i and ii (P.T.S), 1963 and 1964
The millinda Questions (MQ)	:	Mrs. Rhys Davids; London, 1930
Les Questions de milinda	:	Lovis finot; Raris 1923 (French translation of Books i-iii).
Die Frager des konig menandros	:	F. otto. Schrader; Berlin, 1903.

Encyclopedia of Religion and Ethics (E.R.E.): Rhys Davids; vol. viii P. 63 ff. articles or milinda.

Milindapanha and Nagasena Bhishusutra: Bhikku Thich minh chau; Published by Firma K.L. Mukhopadhyaya.

Historical Basis for the question of King Menander : L.A. Waddel; J.R.A.S. Tibetur, 1897

Nagasena : T.W. Rhys Davics; J.R.A.S., 1891

A History of Pali Literature : B.C. Law; vol. ii., 1933

History of Indian literature (HIL) : Winternitz; vol.ii

Political History of Ancient India : H.C. Roy Chaudhuri, (P.H.A.I) C.U, 1953

The debate of king milinda : Bhikku pesala; Buddha Dharma Education Association Inward path, 2001, Pengrg.

Buddhist Records of the western world : S. Beal; London, 1884 (Reprinted, Delhi, 1981)

Ancient Geography of india : A. Curringham; London, 1871, Enlarged ed. varanasi, 1975,

A History of pre-Buddistic Philosophy : B.M. Barua; University of calcutta, 1921.

The Wonder that was India : A.I. Basham; London 1954

On yuas Chwang's Travels in India : Tomas Watters; London, Royal Asiatic Society, 1908.

বিভিন্ন জার্নাল, প্রবন্ধ ও স্মরনিকা :

Journal of the department of pali : University of calcutta, 1982

India History Quarterly : Sep. vol. 4., 1928 (IGQ)

Journal of the pali text Society : London, 1883 (JPTS)

Journal of the pali text Society : vol. 15.1990

অনোমা : বাঙালী বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য; দেবপ্রিয় বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ২০০৫ খ্রি.

প্রবন্ধ বিচিত্রা : ইতিহাস ও সাহিত্য; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.।